POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ يَآَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ فَاٰمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٩﴾

অনুবাদ: তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রসুল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর এবং তাঁহার এই রসুল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ এবং তাঁহার বাণী সমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।'

(আল আরাফ: ১৫৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

খণ্ড 11

সংখ্যা 30-31

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

বাৎসরিক চাঁদা ৬০০ টাকা

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 23-30 July 2026 8-15 সফর 1448 A.H

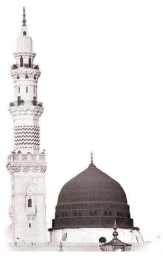

মহানবী (সা.)-এর বাণী

ইবাদত, খোদাভীতি, অত্যধিক ইবাদত এবং কৃতজ্ঞতা

عَنْ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ. فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؛ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলা নামাজে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন যে, তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হলো, "আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাহলে আপনি কেন এত কষ্ট করেন?)" মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, "তাহলে আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, বাব: লি-ইয়াগফিরা লাকা আল্লাহু মা তাকাদ্দামা, হাদিস নং ৪৮৩৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সকল নবীর ওপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমার বিশ্বাসই আমার

"আর তারা তো ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তারা সবাই যদি একত্রিতও হতেন, তবুও তারা সেই কাজ এবং সেই সংস্কার সাধন করতে পারতেন না, যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁদের সেই হৃদয় এবং সেই শক্তি ছিল না, যা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দান করা হয়েছিল। যদি কেউ বলে যে, এটি-নাউযুবিল্লাহ-নবীগণের প্রতি অসম্মান, তবে সেই অজ্ঞ ব্যক্তি আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করছে। আমি নবীগণের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করাকে আমার ঈমানের অংশ বলে মনে করি। কিন্তু সকল নবীর ওপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমার বিশ্বাসই আমার ঈমানের সর্ববৃহৎ অংশ এবং তা আমার শিরা-উপশিরা ও রক্তের প্রতিটি কণায় মিশে আছে। এটি আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যে আমি তা হৃদয় থেকে বের করে দিই। দুর্ভাগা প্রতিপক্ষ, যার দেখার চোখ নেই, সে যা ইচ্ছা বলুক। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন, যা অন্যরা না পৃথকভাবে, না সম্মিলিতভাবে করতে পেরেছেন। আর এটি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। ' ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء '-'এটি আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।' (মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৪)

তৌহীদ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা

হযরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানি রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন, তা এমন একটি বিষয়, যার সঙ্গে তাওহীদের সম্পর্ক কী-এটি আজও পৃথিবী পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। সেই বিষয়টি হলো, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে ঘোষণা করেছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীতেই ধারাবাহিকভাবে নবীগণ আগমন করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই বিষয়টির সঙ্গে তাওহীদের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই বিষয়টি গ্রহণ না করলে তাওহীদ কোনোভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশ্বাস না করা হবে যে, আল্লাহ মিসর, ইরান, ভারত, চীন, জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও নবী প্রেরণ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদ পূর্ণ হতে পারে না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আবির্ভাবের পর এই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুতরাং পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে: إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (সুরা ফাতির: ২৫)-অর্থাৎ, এমন কোনো জাতি অতিবাহিত হয়নি, যার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সতর্ককারী আসেননি। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا (সুরা আন-নাহল: ৩৭)-অর্থাৎ, আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। এর সঙ্গে তাওহীদের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ -অর্থাৎ, আমরা রাসুলগণকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং মিথ্যা উপাস্য (তাগূত) থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেন।

অতএব, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীর সামনে এই ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন যে, শুধু আমাদের মধ্যেই সত্য এসেছে এবং আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর অবশিষ্ট মানবজাতিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন-এ কথা বলা ভুল। সত্য কথা হলো, এমন কোনো জাতি অতিবাহিত হয়নি, যার মধ্যে নবী ও রাসূলগণ আগমন করেননি।"

(হযরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক ২ জুন ১৯২৯ সালে কাদিয়ানে জলসা সিরাতুন্নবী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ) (তাফসীরে কবীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪৮-৬৪৯)

আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ সম্পাদকীয়

সীরাতুন্নবী (সা.)-এর ঈমান উদ্দীপক আলোচনা

পঞ্চম খেলাফতের এই বরকতময় যুগ বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ নেতা হযরত মুহাম্মদ আরবী (সা.) এবং তাঁর মহান সাহাবিগণ রিজওয়ানুল্লাহ আনহুম আজমাঈন-এর মনোমুগ্ধকর ঘটনাবলির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু বছর ধরে খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) মহানবী (সা.)-এর সাহাবিগণের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাগুলো বর্ণনা করে চলেছেন। তিনি তাঁদের হৃদয়স্পর্শী ত্যাগের কথা এ উদ্দেশ্যে তুলে ধরছেন, যেন আমরা আহমদীরাও নিজেদের জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনতে পারি এবং সেই মহান সাহাবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, হযরত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই যুগও সাহাবিদের যুগ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"প্রতিশ্রুত মসীহের সঙ্গে যে জামাআত রয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন একটি মর্যাদা দান করেছেন, যা সাহাবিদের জামাআতের সমতুল্য। 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যদেরও, যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি।' তাফসিরকারগণ স্বীকার করেছেন যে, এর দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহের জামাআতকেই বোঝানো হয়েছে, এবং এই জামাআত এমন হবে যেন তারা সাহাবিদেরই জামাআত।"

একইভাবে তিনি আরও বলেন-

"সাহাবিদের জামাআত বলতে কেবল তাঁদেরকেই মনে করো না, যারা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছেন। আরেকটি দলও রয়েছে, যাদের কথা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তারাও সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত-তারা হলো সেই সকল লোক, যারা আহমদের আবির্ভাবের সঙ্গে থাকবে।"

(তাফসির হযরত মসীহ মওউদ, সূরা আল-জুমুআহ, পৃষ্ঠা ১৪০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বরকতময় যুগে এই মহান সাহাবিদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর পর তাঁর সম্মানিত খলীফাগণ এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আর পঞ্চম খেলাফতের এই বরকতময় যুগে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সময় থেকে যত দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) মহানবী (সা.)-এর সাহাবিদের অতুলনীয় ত্যাগের ঘটনাবলি বর্ণনা করে আমাদের মধ্যেও সেই একই চেতনা সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যদেরও'-এই আয়াতের মধ্যে এদিকেও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেমন এই জামাআত প্রতিশ্রুত মসীহের সাহাবিদের (রা.) জামাআতের অনুরূপ, তেমনি এই জামাআতের ইমামও রূপকভাবে পবিত্র মহানবী (সা.) -এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন মহানবী (সা.) নিজেই প্রতিশ্রুত মাহদীর একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁরই অনুরূপ হবেন।"

(আইয়্যামুস সুলহ, সূত্র: তাফসির হযরত মসীহ মওউদ, সূরা আল-জুমুআহের তাফসির, পৃষ্ঠা ১৩২)

আমাদের প্রিয় নেতা হযরত আমীরুল মুমিনীন (আই.) ৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে প্রদত্ত এক জুমার খুতবায় মহান সাহাবিগণের ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- "সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও সহমর্মিতার এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের সামনে এমন এক মহিমান্বিত রূপে প্রকাশিত হয় যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়।মহনবী (সা.)-এর পবিত্র শক্তি শুধু তাঁদের ভালোবাসার দিকই পরিবর্তন করেনি। আগে তাঁদের ভালোবাসা ছিল অন্যদিকে, পরে তা অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল-পৃথিবী থেকে আল্লাহর দিকে। শুধু তাই নয়, তিনি সেই ভালোবাসার মানদণ্ডকে এমন উচ্চতায় উন্নীত করেছিলেন, যার কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আগে ছিল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই উন্নতি ও উচ্চতার একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরে বলেছেন যে, এই স্তরের ভালোবাসা ও ত্যাগের কোনো দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী নবীদের জীবনেও পাওয়া যায় না। আর নবীদের অনুসারীদের কথা যদি বলা হয়, তবে তাঁদের অবস্থা সাহাবিদের তুলনায় অনেক নিম্নমানের ছিল। এই সাহাবিগণ সব ধরনের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র ছিলেন। নির্মল হৃদয় নিয়ে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহও অশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আমরা সাহাবিদের জীবনেই এসব বিষয় প্রত্যক্ষ করি।" (বদর, ৫/১২ এপ্রিল ২০১৮)

হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বহু বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে মহান সাহাবিগণের জীবনচরিত বর্ণনা করে আসছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মহান সাহাবিদের সদৃশ করেছেন। অতএব, সাহাবিদের মধ্যে যে নিষ্ঠা ও ত্যাগের চেতনা ছিল, সেই একই নিষ্ঠা ও সেই একই ত্যাগের চেতনা আমাদের মধ্যেও থাকা উচিত। আমাদের হৃদয়েও মহানবী (সা.)-এর প্রতি সেই একই ভালোবাসা ও অনুরাগ থাকা উচিত, যা মহান সাহাবিদের হৃদয়ে ছিল-যে ভালোবাসা তাঁদেরকে আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, আহমদিয়া জামাআতে এমন বহু মানুষ রয়েছেন, যারা মহান সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁদের ইমামের আহ্বানে "লাব্বাইক"বলে সাড়া দিয়ে অতুলনীয় ও চিরস্থায়ী ত্যাগের স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাচ্ছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যদেরও'-এই ঘোষণা দ্বারা যখন মহান আল্লাহ এই জামাআতকে সাহাবিদের সঙ্গে একত্রিত করেছেন, তখন তাঁদের মধ্যেও সাহাবিদের মতো নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আত্মনিবেদন থাকা উচিত। সাহাবিগণ কী করেছিলেন? তাঁরা যেভাবে আল্লাহর মহিমার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই পথই গ্রহণ করেছিলেন, এমনকি সেই পথে নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের স্ত্রীরা বিধবা হয়ে যাবেন, তাঁদের সন্তানরা এতিম হয়ে যাবে এবং মানুষ তাঁদের উপহাস করবে। কিন্তু তাঁরা এসবের কোনো কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাঁরা সবকিছু মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান তাঁরা এনেছিলেন, তার বহিঃপ্রকাশ থেকে কখনও বিরত হননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ঈমান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়; এতটাই যে, তার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।"(আল-হাকাম, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৪০, ১০ নভেম্বর ১৯০২, পৃষ্ঠা ৩)(সূত্র: তাফসির হযরত মসীহ মওউদ (আ.) , সূরা আল-জুমুআহের তাফসির, পৃষ্ঠা ১৫০)

অতএব, হযরত আমীরুল মুমিনীন (আই.))-এর সেই খুতবাগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করা ও শ্রবণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী, যেখানে মহানবী (সা.)-এর মহান সাহাবিদের ত্যাগের হৃদয়স্পর্শী ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আমরাও নিজেদের মধ্যে সেই একই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারি। কারণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে আমাদেরকে সাহাবিদের জামাআতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই একই ত্যাগ আজ আমাদেরও আহ্বান জানাচ্ছে। আর সারা বিশ্বে আমাদের অধিকাংশ ভাই খেলাফতের ছায়াতলে থেকে এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত পেশ করে চলেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সেই একই তাওফীক দান করুন। আমীন।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

দুইশতবার দরূদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৯ মে , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৯ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজ মনিব ও অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শিক্ষা এবং সুন্নত অনুযায়ী তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাসের বিনয় ও নম্রতার ঘটনাবলি এবং নিজের জামা'তকে এমন বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করার উপদেশ দেবার বিষয়ে আজ আমি কিছু বলব।

তাঁর (আ.) বিনয়ের উন্নত মান দেখে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ১৯০৭ সালের ১৮ই মার্চ তাঁর প্রতি ইলহাম হয়- ' তেরি আজিযানা রাহেঁ উসকো পসন্দ আয়ীঁ' 'তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।' (তাযকেরা,পৃ:৬৭৫ , ২০২৩ এডিশন)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: "এই অধমের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই অধম নিজের দীনতা, নম্রতা, খোদানির্ভরতা, আত্মত্যাগ, নিদর্শনাবলি এবং জ্যোতির্মালার নিরিখে (ঈসা) মসীহ্র প্রথম জীবনের এক নমুনা বা দৃষ্টান্ত। এই অধমের প্রকৃতি ও মসীহ্র প্রকৃতি পরস্পরের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ, যেন তা একই রত্নের দুটি টুকরো অথবা একই বৃক্ষের দুটি ফল। ঐকতানের সীমাপরিসীমার দিক থেকে আত্মিক দৃষ্টির নিরিখে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলে প্রতিভাত হয়; বাহ্যিকভাবেও একটি সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আর তা হলো, মসীহ্ এক কামিল ও মহান নবী অর্থাৎ মূসার অনুসারী ও ধর্মের সেবক ছিলেন এবং তাঁর ইঞ্জিল, তওরাতের একটি শাখা ছিল। এই অধমও সেই মহামহিম নবীর (সা.) তুচ্ছ সেবকদের একজন, যিনি রসূলদের নেতা এবং সকল রসূলের মাথার মুকুট।"

(বারাহীনে আহমাদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, পৃ: ৫৯৩-৫৯৪)

একদা এক ব্যক্তি হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করে, হুযূর 'হকীকাতুল ওহী' লেখার ক্ষেত্রে, যা তাঁর জীবনের শেষভাগে লিখিত গ্রন্থ, এবং প্রুফগুলো বারবার পড়তে অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং এই কারণেই হুযূর বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখন হুযূর কয়েক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করুন এবং লেখাপড়ার কাজ পুরোপুরি পরিত্যাগ করুন।

হযরত সাহেব উত্তরে বলেন, 'আমাদের পরিশ্রম আর কী জিনিস! সাহাবীদের (রা.) পরিশ্রমের দিকে তাকালে আমাদের লজ্জাই পেতে হয় যে, কীভাবে তারা সানন্দে আল্লাহ্র পথে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।'

(মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৮২)

এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "স্বল্প বুদ্ধির লোকেরা আপত্তি করে বলে, আমি নাকি আমার মর্যাদা সীমাতিরিক্ত বর্ণনা করি। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার স্বভাব এবং প্রকৃতিতেই এ বিষয়টি নেই যে, আমি নিজেকে কোনো প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী মনে করব এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে খুশি হবো। আমি সর্বদা নম্রতা ও অজ্ঞাত জীবনযাপন পছন্দ করেছি। কিন্তু এটি আমার শক্তি ও সামর্থ্যের উর্ধ্বে ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাকে বাইরে এনেছেন এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ তাঁর বাণীতে তিনি আমার প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন। এসব প্রশংসা এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)-এরই।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১১৪)

নবাগত মুসলমানদেরও তিনি ইসলামের বিনয় ও সরলতার শিক্ষার বিষয়ে উপদেশ দিতেন। যেমন লেখা আছে, ১৯০৩ সালের ২২শে অক্টোবর হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে মুহাম্মদ আব্দুল হক নামে অস্ট্রেলিয়ার একজন নও-মুসলিম আসেন। আলোচনাকালে হযরত আকদাস (আ.) তাকে বলেন, "আমাদের নীতিমালার মধ্যে একটি হলো, আমরা এক অনাড়ম্বর জীবনযাপন করি। আজকাল ইউরোপ যে-সব কৃত্রিমতাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে রেখেছে, তা থেকে আমাদের বৈঠক পবিত্র। আমরা প্রথা ও অভ্যাসের দাস নই।

আমরা কেবল সেই সীমা পর্যন্ত প্রতিটি অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখি, যা বর্জন করলে কোনো কষ্ট বা পাপের আশঙ্কা থাকে। এছাড়া পানাহার এবং ওঠা-বসার ক্ষেত্রে আমরা অনাড়ম্বর ও সরল জীবনকেই পছন্দ করি।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৯৪-২৯৮)

এগুলো হলো বিনয়ের সেই উন্নত মান, যা তিনি তাঁর জামা'তের সদস্যদের মাঝেও সৃষ্টি করতে চাইতেন। বস্তুত এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"বিনয় অবলম্বন করা উচিত। বিনয় শেখা কোনো কঠিন কাজ নয়; আর শেখারই বা কী আছে, মানুষ তো নিজেই দুর্বল ও অক্ষম। আর সে তো বিনয়ের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয-যারিয়াত:৫৭) 'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।' অহংকার ইত্যাদি সবকিছুই কৃত্রিম। সে যদি এই কৃত্রিমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে তার প্রকৃতিতে বিনয়ই দৃষ্টিগোচর হবে।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ৩৮

কাজেই, এটি হলো সেই মূলনীতি, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ করা যায়।

বিনয় অবলম্বনের উপদেশ দিতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"আশিসমণ্ডিত তারা- যারা নিজেদেরকে সবার চেয়ে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে করে এবং লাজুকতার সাথে কথা বলে এবং দরিদ্র ও মিসকীনদের সম্মান করে এবং দুর্বলদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করে এবং দুষ্কৃতি ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে কখনো ঠাট্টাবিদ্রূপ করে না এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ রাখে আর পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। অতএব, আমি বার বার বলছি, এরাই সেসব মানুষ যাদের জন্য নাজাত বা পরিত্রাণ প্রস্তুত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতি ও অহংকার, স্বার্থপরতা, দম্ভ, জগৎপূজা, লোভ এবং অপকর্মের জাহানড়বাম থেকে এই জগতেই মুক্তি লাভ করে নি, সে পরকালেও তা থেকে কখনো মুক্তি লাভ করতে পারবে না। অর্থাৎ, এই জগতে যে-সব সৎকর্ম করা হবে, সেগুলোই পরকালেও কাজে আসবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি কী করব এবং কোথা থেকে এমন শব্দাবলি নিয়ে আসব যা এই দলের সদস্যদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে? অর্থাৎ আমার মান্যকারীদের ওপর। হে খোদা! আমাকে এমন শব্দাবলি শেখাও এবং এমন বক্তব্য ইলহাম করো, যা এসব হৃদয়ের ওপর স্বীয় জ্যোতি বর্ষণ করবে এবং স্বীয় প্রতিষেধক গুণের মাধ্যমে তাদের বিষ দূর করে দেবে। আমার প্রাণ এই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে আছে যে, কখনো কি এমন দিন আসবে, যে-দিন আমি আমার জামা'তের মাঝে অধিক হারে এমন লোকদের দেখব, যারা সত্যিকার অর্থেই মিথ্যা বর্জন করেছে এবং নিজেদের খোদার সাথে এক সত্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে যে, তারা প্রত্যেক মন্দ থেকে নিজেদের দূরে রাখবে এবং অহংকার থেকে- যা সকল অনিষ্টের মূল- তা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে যাবে এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করতে থাকবে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬ , পৃ:৩৯৮)

কোনো কোনো মানুষের জলসা কিংবা কোনো অনুষ্ঠান হলে, বিশেষভাবে সামনের চেয়ারে বসার আকাঙ্ক্ষা থাকে। জলসা ইত্যাদিতে সাধারণত গ্রিন এরিয়া বা এমন এলাকা থাকে, যেখানে বিশেষভাবে সামনে বসার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকে। যুগ-খলীফার কাছাকাছি বসে তাঁর কথা শোনার জন্য হলে বিষয়টি ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় এর সাথে অহমিকাও যুক্ত হয়ে যায়। এটি হওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে আয়োজকদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়।

যাইহোক, এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণকারীদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "মানুষের উচিত, সে কোথাও গেলে নিজের জন্য সবচেয়ে নীচু স্থানটি বেছে নেওয়া। আর সে যদি অন্য কোনো স্থানের যোগ্য হয়, তবে আয়োজকরা স্বয়ং তাকে ডেকে জায়গা দেবেন এবং তাকে সম্মান করবেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ৯৩)

যদি সামনে বসাতে হয়, তাহলে ঠিক আছে, একটি নেযাম বা ব্যবস্থাপনা রয়েছে; তারা বলে, 'আবেদন করুন, আমরা দেখব'। ব্যবস্থাপনা যদি আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা না করে কিংবা কোনো অপারগতার কারণে (আবেদন) নামঞ্জুর করে থাকে, তাহলে কোনো প্রকার আপত্তি না করে, মনে কোনো অভিযোগ সৃষ্টি না করে তাদের কথা মেনে নেওয়া উচিত।

আবার ঐশী ভালোবাসা লাভের জন্যও বিনয় আবশ্যক।

এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, "কোনো ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং ঐশী সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না তার মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। প্রথমত, অহংকার চূর্ণ করা, যেভাবে একটি দণ্ডায়মান পাহাড় যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে- তা ধসে পড়ে মাটির সাথে মিশে যায়;

অনুরূপভাবে মানুষেরও উচিত যাবতীয় অহংকার এবং অহমিকাপূর্ণ চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করা; দীনতা, নম্রতা এবং বিনয় অবলম্বন করা।

আর দ্বিতীয়টি হলো, তার পূর্বের যাবতীয় সম্পর্ক ছিনড়ব হয়ে যাওয়া; যেমনটি পাহাড় ধসে পড়ে 'মুতাসাদ্দিআন' হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে যেভাবে 'মুতাসাদ্দিআন' শব্দ এসেছে, অর্থাৎ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, এক ইট থেকে আরেক ইট আলাদা হয়ে যায়; ঠিক তেমনি তার পূর্বের যে-সব সম্পর্ক নোংরামি ও খোদার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, সে সমস্ত সম্পর্ক যেন ছিন্ন হয়ে যায়।" এর অর্থ হলো, যে-সব পুরনো সম্পর্ক থেকে তোমাদের মাঝে মন্দের জন্ম হচ্ছিল, সেসব মন্দ সম্পর্ককে ছিন্ন করা। এর অর্থ এটি নয় যে, সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্কই ছিন্ন করতে হবে, যেন এরপর পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আর এখন তার সমস্ত সাক্ষাৎ, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং শত্রুতা কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্যই নিবেদিত থাকে।"(মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৭১)

সে যে কাজই করুকতা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়। এক স্থানে তিনি বলেন:আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার পাপ থেকে বাঁচার জন্য 'ইয়্যাকা না'বুদু ওইয়্যাকা নাসতাঈন' (সূরা আল-ফাতিহা:৫) আয়াতটি রয়েছে; অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। যে-সব লোক নিজেদের প্রভুর সম্মুখে নম্রতার সাথে দোয়ায় রত থাকে যেন তাদের কোনো বিনয় গৃহীত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প বর্ণনা করেন; এক ইবাদতকারী ব্যক্তি অনেক দোয়া করত যে, হে আল্লাহ! আমাকে পাপ থেকে মুক্তি দাও। সে অনেক দোয়া করার পর ভাবল, সবচেয়ে বেশি বিনয় কীভাবে প্রকাশ করা যায়, কীভাবে বিনয়ী হওয়া সম্ভব, বিনয় প্রকাশের উপায় কী? তখন চিন্তাভাবনা করে তার মনে হলো, কুকুরের চেয়ে বেশি দীন ও নীচ আর কিছু নেই। তাই সে কুকুরের মতো আওয়াজ করে কাঁদতে শুরু করল। অন্য এক ব্যক্তি মনে করল যে, মসজিদে কুকুর ঢুকে পড়েছে। (সে ভাবে,) কোথাও আমার পাত্র না নোংরা করে ফেলে। তখন সে এসে দেখল, সেখানে সেই ইবাদতকারী ব্যক্তিই উপস্থিত, সেখানে কোনো কুকুর নেই। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল, এখানে কুকুর কাঁদছিল, আমি আওয়াজ পেয়েছি; কোথায়? তখন সেই ইবাদতকারী বলল, আমিই সেই কুকুর। সেই ব্যক্তি এরপর জিজ্ঞেস করল, তুমি এভাবে কাঁদছিলে কেন? সে বলল, খোদা তা'লা বিনয় পছন্দ করেন; তাই আমি ভাবলাম, এভাবে হয়ত আমার বিনয় গৃহীত হয়ে যাবে।" (মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ২১০)

যা-ই হোক, এটি ছিল তার চিন্তাধারা এবং সেই অনুযায়ী সে আমল করেছে। উদ্দেশ্য ছিল- সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও নগণ্য হয়ে হলেও যেন কোনোভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন:

"মানুষ- যে কিনা এক দুর্বল ও অক্ষম সৃষ্টি- সে নিজের কর্মদোষের কারণে নিজেকে বড়ো মনে করতে শুরু করে।

এটি তার কর্মদোষই বটে, যার ফলে বড়ত্বের অহমিকা সৃষ্টি হয়, অহংকার ও দম্ভ তার মাঝে এসে যায়। আল্লাহ্র পথে যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে সবার চেয়ে ক্ষুদ্র মনে করবে, ততক্ষণ সে মুক্তি পেতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৩৮)

তাঁর (আ.) হাতে বয়আতকারীদের বিনয়ের সর্বোচ্চ মান অর্জনের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

"এই যে বয়আত, এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজেকে বিক্রি করে দেওয়া। এর কল্যাণ ও প্রভাব এই শর্তের সাথেই সম্পৃক্ত। যেমন, একটি বীজ যখন মাটিতে বপন করা হয়, তখন এর প্রাথমিক অবস্থা এটিই হয়ে থাকে যে, কৃষকের হাতে বপিত হয়েছে এবং এর কোনো খবর থাকে না- এখন এটি কোথায়, কী অবস্থায় থাকবে। মাটিতে ফেলে দেওয়া হলো, মাটির ভেতর হারিয়ে গিয়েছে; এখন আর জানা নেই এর কী পরিণতি হবে। কিন্তু যদি সেই বীজটি উন্নত মানের হয় এবং এর মাঝে বেড়ে ওঠার শক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে খোদার কৃপায় এবং সেই কৃষকের চেষ্টায় তা ওপরে উঠে আসে। তা অঙ্কুরিত হয়, এর কুঁড়ি বেরিয়ে আসে। আর (সেটি) এক দানা থেকে হাজার দানায় পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, বয়আতকারী ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করতে হয় এবং নিজের আমিত্ব ও প্রবৃত্তি থেকে পৃথক হতে হয়। তখনই সে বিকাশের যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি বয়আতের পর নিজ অবাধ্য প্রবৃত্তিকেও লালন করে, সে কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ:৩০৬-৩০৭)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Waseya Begum, Harhari (Murshidabad)

বিনয় ছাড়া তো বয়আতেরও কোনো লাভ নেই।

তিনি বলেন, "তোমরা যতটা কোমলতা অবলম্বন করবে এবং যতটা নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি ঠিক ততটাই সন্তুষ্ট হবেন।" (মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃ: ৬৬)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি কামনা করে, খোদা তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৯৪-২৯৮)

অতঃপর বিনয় প্রসঙ্গে অথবা বিনয় প্রদর্শন করলে কী লাভ হয় এবং অহংকার মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

"প্রথমে আদমও পাপ করেছিলেন এবং শয়তানও পাপ করেছিল; কিন্তু আদমের মাঝে অহংকার ছিল না, তাই তিনি খোদা তা'লার সমীপে নিজ পাপ স্বীকার করেন এবং তাঁর পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটি হতে বুঝা যায়, মানুষের জন্য তওবার কল্যাণে পাপ ক্ষমার আশা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আদমের পাপ ক্ষমা করেছেন। তাই মানুষও যদি বিনয় প্রদর্শন করে, তওবা করে, তবে তার আশা রাখা উচিত- আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শয়তান অহংকার করেছিল এবং সে অভিশপ্ত হয়েছে, তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ নিপতিত হয়। আর যে বিষয়টি মানুষের মাঝে নেই, (অর্থাৎ অহংকার; শয়তানের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তা মানুষের মাঝে নেই, মানুষ তো বিনয়ী হতে পারে;) অহংকারী ব্যক্তি অযথা নিজের জন্য সেই জিনিসের দাবি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অহংকার মানুষের প্রকৃতিতেই নেই, তা সত্ত্বেও সে শয়তানের মতো অযথাই বড়ো হবার দাবি করতে শুরু করে। তিনি আরও বলেন, নবীদের মাঝে অনেক গুণ থাকে, সেগুলোর মধ্যে একটি গুণ হলো আমিত্ব বর্জন। অর্থাৎ, নিজের আমিত্বকে পিষ্ট করা। তাদের মাঝে কোনো অহংবোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাঁরা নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেন। গর্ব কেবল খোদারই জন্যই নির্ধারিত। যারা অহংকার করে না এবং বিনয় অবলম্বন করে- তারা কখনো ধ্বংস হয় না।"(মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃ: ১৭৩)

অতঃপর বিনয় অবলম্বনের উপদেশ দিতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেছেন: "এখনো জামা'তে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য কোনো কথা শুনলেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অথচ এ ধরনের সকল উত্তেজনা দমন করা অত্যন্ত জরুরি, যেন স্বভাবে সহনশীলতা ও নমনীয়তা সৃষ্টি হয়। দেখা যায়, একটি সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে একে অপরকে পরাস্ত করার চিন্তায় মগড়ব হয়ে পড়ে। একে অপরকে পরাস্ত করার চিন্তায় থাকে যে, কীভাবে আমি বিজয়ী হবো। এমন মুহূর্তে প্রবৃত্তির উত্তেজনা এড়ানোর চেষ্টা থাকা উচিত এবং বিবাদ মেটানোর স্বার্থে ছোটোখাটো বিষয়ে সজ্ঞানে নিজেই নিজের অবমাননা বা পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত। প্রতিযোগিতায় নিজের অন্য ভাইকে অপদস্থ করার চেষ্টা কখনোই করা উচিত নয়।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৬৫

আমরা যদি আমাদের জীবনে এর পর্যালোচনা করি, তবে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা এই মিথ্যা আত্মমর্যাদাবোধ রাখে এবং তাদের মাঝে অহংকার বা আমিত্ব বিদ্যমান, যে কারণে ঝগড়াবিবাদও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা থাকে, তবে এ থেকে মুক্তি লাভ হয়। এমনকি কেউ কেউ তো অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কখনো কখনো অন্যায়ভাবে এই অভিযোগ দায়ের করে বসে যে, অমুক জায়গায় আমাদের ঝগড়া হয়েছিল, অমুক জায়গায় সে আমাকে বাজে কথা বলেছিল, তাই এখন আমি তাকে অন্যায়ভাবে হলেও মিথ্যা মামলা বা কোনো শাস্তির মুখোমুখি করব।

এক স্থানে বিনয় অবলম্বনকারীদের মৃত্যুর পরের দৃষ্টান্ত প্রদান করে তিনি (আ.) বলেন, "মৃত্যু তো সবার জন্য অবধারিত। একদিন এই পৃথিবী থেকে যেতেই হবে। পরিশেষে এক না একদিন সবার সাথেই এই অবস্থা হতে যাচ্ছে। তবে দীনতার সাথে, নিরীহ হয়ে, অসহায়ের ন্যায় এবং বিনয়ের সাথে যে মানুষ মৃত্যুবরণ করে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেন বেহেশত অগ্রসর হয়ে আসে। যেমন, হযরত ঈসা (আ.) লাযের সম্পর্কে বলেছিলেন।"

(মালফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃ: ২৮৯-২৯০)

লাযের কে ছিল- যার উল্লেখ করা হয়েছে? এই ঘটনা ইঞ্জিলের লুক অধ্যায়ে লেখা আছে। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। সে লাল রঙের মিহি কাপড় পরিধান করত। রঙ-বেরঙের নরম মসৃণ কাপড় পরিধান করত। সে প্রতিদিন আনন্দ উদযাপন করত আর জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করত। ইঞ্জিলে এই

মহান আল্লাহ্র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

ঘটনা লিখিত আছে। আর লাযের নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, যার সর্বাঙ্গ দুরারোগ্য ক্ষতে ভরা ছিল। ফোড়া-পাঁচড়া বের হয়েছিল, চর্মরোগ ছিল। তাকে তার (অর্থাৎ ধনাঢ্য ব্যক্তির) দরজায় এনে রাখা হয়। সে সেই ধনী ব্যক্তির দরজায় বসে থাকত। সে এই আশায় থাকত যে, ধনী ব্যক্তির খাবারের টেবিলের উচ্ছিষ্ট টুকরা দ্বারা নিজের ক্ষুধা মেটাবে, অর্থাৎ সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া খাবার বাইরে নিক্ষেপ করলে আমিও খাব। এমনকি কুকুরও এসে তার ক্ষত চাটত! এতো দুর্বল ও করুণ দশা ছিল যে, কুকুরকেও তাড়াতে পারত না আর কুকুরও এসে তার ক্ষত চাটত। বাইবেলে লেখা আছে, পরিশেষে এমন হয়েছে যে, সেই দরিদ্র ব্যক্তিটি মারা যায় আর ফেরেশতারা তাকে নিয়ে গিয়ে ইবরাহীম (আ.)-এর কোলে রেখে দেয়। আর ধনী ব্যক্তিটিও মারা যায় আর তাকে দাফন করা হয়। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, সে আত্মিক জগতে আযাবে নিপতিত হয়ে নিজের চোখ তুলে তাকায় আর ইবরাহীম (আ.)-কে দূর থেকে দেখে এবং তাঁর কোলে লাযেরকে দেখতে পায়। সে চিৎকার করে বলে, হে পিতা ইবরাহীম! আমার প্রতি কৃপা করে লাযেরকে প্রেরণ করুন যেন সে নিজের আঙ্গুলের ডগা পানিতে ভিজিয়ে আমার জিহ্বাকে সিক্ত করে। লাযেরকে পাঠিয়ে দিন যেন আমাকে এই শাস্তি থেকে বাঁচায় আর নিজের আঙ্গুল ভিজিয়ে অন্তত পানি আমার জিহ্বায় দেয়। কেননা আমি এই আগুনে ছটফট করছি। ইবরাহীম (আ.) বলেন, বৎস! স্মরণ করো! তুমি ইহলোকে বিলাসিতা করেছ আর লাযের মন্দ জিনিস দেখেছে। সে তো দুনিয়াতে কিছুই পায় নি। কিন্তু এখন সে এখানে আরাম-আয়েশ লাভ করছে আর তুমি ছটফট করছ।" (লুকা, অধ্যায়-১৬,আয়াত: ১৯-২৫)

মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অতএব পরিশেষে অহংকার প্রদর্শনকারীদের এই পরিণতিই হয়।

"মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন গরীব, অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেই আচরণ না করবে যা একজন উচ্চবংশীয় মর্যাদাবান ব্যক্তির সাথে করে থাকে বা করা উচিত, এবং সকল প্রকার অহংকার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা থেকে নিজেকে রক্ষা না করবে- সে কখনো ঐশী রাজত্বে স্থান পাবে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৩৮)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "অহংকারী খোদার আসনে বসতে চায়। সুতরাং এই নোংরা অভ্যাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বদা খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করো। খোদা তা'লার সব প্রতিশ্রুতিও যদি তোমাদের সাথে থাকে তাহলেও তোমরা বিনয় অবলম্বন করো, কেননা বিনয় অবলম্বনকারীই খোদা তা'লার প্রিয় হয়ে থাকে।" (মালফুযাত, ১০ম খন্ড, পৃ: ২১৭)

অতঃপর বিনয় ও দীনতা সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, "বিনয় ও দীনতা উৎকৃষ্ট জিনিস। যে ব্যক্তি অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অহংকার করে সে কখনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। তার উচিত বিনয় অবলম্বন করা। বলা হয়ে থাকে, জালীনুস হাকীম এক বাদশার চাকরি করত। এটি আরেকটি ঘটনা। বাদশার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি স্বাস্থ্যহানীকর খাবার গ্রহণ করতেন। এতে জালীনুসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বাদশা অবশ্যই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবে। ক্ষতিকর খাবার ছিল। বর্তমানেও বলা হয়ে থাকে, 'জাঙ্ক ফুড বর্জন করো'। হয়ত সেই যুগেও এ ধরনের ব্যাপার ছিল। যাহোক, জালীনুসের বিশ্বাস ছিল, এই জিনিসগুলো তাকে অসুস্থ করে তুলবে, এমনকি কুষ্ঠ রোগের কারণও হতে পারে। একারণে তিনি বাদশাকে বিরত রাখতে চাইতেন, কিন্তু বাদশা বিরত হতেন না। এতে অতিষ্ঠ হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে জালীনুস নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যায়। সে বাদশার রাজদরবার পরিত্যাগ করে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যায়। কিছুদিন পর বাদশার শরীরে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পরিশেষে তা-ই হলো যা জালীনুস বলেছিল। কুষ্ঠরোগ হওয়া শুরু হলো। তখন বাদশা নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তিনি বিনয় অবলম্বন করেন। নিজের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ফকিরের বেশে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং জালীনুসের কাছে পৌছান। জালীনুস তাকে চিনতে পারেন এবং বাদশার বিনয় তার পছন্দ হয়। অর্থাৎ, বিনম্রতা তার পছন্দ হয় এই ভেবে যে, তিনি বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন, আমার কাছে চলে এসেছেন। আর তিনি তার চিকিৎসায় পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, ফলে খোদা তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেন।"

(মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮)

নিজের একটি বৈঠকে তাঁর ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) যে উপদেশ প্রদান করেছেন তার উল্লেখ রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে যে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) ফজরের সময় এসে নামাযের পূর্বে কিছুক্ষণ সময় বৈঠক করেন। অর্থাৎ, [তিনি (আ.)] ফজরের নামাযের পূর্বে আসেন এবং বৈঠক করেন আর اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا وَاسْتَکْبَرُوْا অর্থাৎ 'আমি তোমার ঘরের চতুঃসীমার মাঝে বসবাসকারীদের নিরাপত্তা প্রদান করব, কেবল সে-সকল লোক ব্যতীত যারা দম্ভ ও অহংকার করেছে'-এই ইলহাম সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এক্ষেত্রে ঔদ্ধত্য ও অহংকার বলতে ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার অহংকার বোঝায় না, বরং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে বিনয়ী ও বিনম্রভাবে উপস্থাপন করে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে না, তারা দরিদ্র হলেও এর অর্ন্তভুক্ত।"(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৪৩-৪৪৪)

বিনয়াবলম্বনকারীই (এই) গৃহে প্রবেশকারী হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, "মানুষ যখন সফলতা লাভ করে এবং কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্ত হয় না, সেই সময়ে যে ব্যক্তি বিনয়াবলম্বন করে এবং খোদাকে স্মরণ রাখে- সে-ই কামিল।" (মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৪১৭)

তিনি (আ.) এই বিষয়গুলো জামা'তকে কেবল উপদেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হন নি বরং নিজ কর্মের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। শুরুতে আমি যেটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (বিনয়ী) কর্ম পছন্দ করেছেন। যাই হোক, কতিপয় রেওয়ায়েত তাঁর নিজের আচারআচরণ সংক্রান্ত।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, আমাকে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেছেন, দাদাজান আমাদের জেঠা মির্যা গোলাম কাদের সাহেবকে বৈঠকে বসার জন্য চেয়ার প্রদান করতেন। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড়ো ভাইকে বৈঠকে বসার জন্য চেয়ার দেওয়া হতো, অর্থাৎ তিনি যখন দাদাজানের কাছে যেতেন তখন তাকে (দাদাজান) চেয়ারে বসাতেন। কিন্তু আব্বাজান গিয়ে নীচে জনসাধারণের সারিতে বসে পড়তেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখনই এমন বৈঠকে যেতেন, পেছনে সাধারণ মানুষের সারিতে বসতেন, সেখানে বসে পড়তেন। (বৈঠকে) কখনো দাদজান তাঁকে ওপরে (চেয়ারে) বসতে বললে আব্বজান বলতেন, আমি এখানে বসেই ভালো আছি।(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, রেওয়ায়েত নং-১৯২, পৃ: ১৯৯-২০০)

তাঁর কখনো উঁচু স্থানে বসার আকাঙ্ক্ষা হয় নি, বরং সাধারণ মানুষের সাথে বসতেন।

যেভাবে তিনি ইতোপূর্বে উপদেশ প্রদান করেছেন, আয়োজকরাই আপনাকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেবে। তিনি নিজে সারা জীবন এর ওপর আমল করেছেন।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, আমাকে কাজী আমীর হোসেন সাহেব বলেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট জানতে চাইলাম, হুযূর! হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, সকল নবী ছাগল চরিয়েছেন। হুযূর কি কখনো (ছাগল) চরিয়েছেন? তিনি (আ.) বর্ণনা করেন, হ্যাঁ। আমি একবার বাইরে মাঠে যাই। সেখানে এক ব্যক্তি ছাগল চরাচ্ছিল। সে বলে, আমি একটি কাজে যাচ্ছি, আপনি আমার ছাগলগুলোর খেয়াল রাখুন। কিন্তু গেলো তো গেলই। সন্ধ্যায় ফিরে এল, আর তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে তার ছাগল চরাতে হয়েছে।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, রেওয়ায়েত নং-১০৮, পৃ: ৮৮)

পুরো দিন আমি তার ছাগল চরাতে থাকি। অথচ তিনি সেই অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জমিদারের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি এটিকে অসম্মানজনক মনে করেন নি এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ব্যক্তির ছাগল চরাতে থাকেন, যে তাঁদের বর্গাচাষী বা কাজের লোক ছিল।

একইভাবে তাঁর (আ.) বিনম্রতার উল্লেখ করে আল-ফযল দপ্তরের কর্মী হযরত খাজা আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন,

"আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দারোয়ান ছিলাম। আমি নিরাপত্তার খাতিরে, আগন্তুকদের সংবাদ পৌঁছে দিতে বা অবগত করতে অথবা তাঁর (আ.) জরুরি কোনো কাজ করার জন্য তাঁর (আ.) দরজার বাইরে বসে থাকতাম এবং হুযূরের ঘরের ভেতরেও দীর্ঘ সময় ছিলাম, ভেতরেও যাতায়াত ছিল। কিন্তু আমি কখনো হযরত সাহেবকে 'জি' বলা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ বলতে শুনি নি। হযরত সাহেব যখনই আমার সাথে কথা বলতেন, সর্বদা 'জি' বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন। যখনই কথাবার্তা বলতেন তখন জি শব্দের ব্যবহার অবশ্যই করতেন। আমি তাঁর মাঝে কখনো অহংকার ও দম্ভ দেখি নি। তিনি বলেন, আমি তাঁর মাঝে কখনো অহংকার ও দম্ভ দেখি নি। সর্বদা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। তাঁর চেহারায় সর্বদা এক ধরনের প্রফুল্লতা বিরাজ করত। তাকে কখনো ভ্রূ কুঁচকাতে বা কপালে ভাঁজ ফেলতে দেখি নি। কখনো তাঁর কপালে (বিরক্তির) ভাঁজ দেখি নি। আমি কখনো হযরত সাহেবকে কাউকে 'ওই' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করতে শুনি নি।"

(রেওয়ায়েত আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪-২৯৫)

তিনি কখনো 'ওই' বা 'তুই' শব্দ ব্যবহার করতেন না। সর্বদা অত্যন্ত সম্মানের আচরণ করতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে,

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনো ঘরের কাজ করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি নিজের চারপাই (ছোটো চৌকি) নিজেই লাগিয়ে নিতেন, মেঝে ঠিক করতেন অর্থাৎ মোছা বা ঝাড়ু দেবার কাজও নিজেই করে নিতেন; বিছানা নিজেই তৈরি করতেন এবং ঝাড়ু দিতেন। কখনো হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে, ছোটো বাচ্চারা তো চৌকিতে ঘুমিয়ে থাকত, হযরত সাহেব

নিজে একপাশ থেকে তাদের চৌকি ধরতেন এবং অন্যপাশ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি ধরত এবং ভেতরে বারান্দায় নিয়ে আসতেন।"

বর্তমানে তো এসি এবং ফ্যান ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু সেই যুগে তো এগুলো ছিল না। তাই গরমের দিনে মানুষ বাইরে উঠানে ঘুমাতো। আর রাতে ঝড় বা বৃষ্টি আসলে চৌকি উঠিয়ে ভেতরে বারান্দায় নিয়ে আসতে হতো। তিনি (আ.) শিশুদের চৌকি ওঠাতে সাহায্য করতেন। "এমন পরিস্থিতিতে বা সকালের দিকে কেউ যদি শিশুদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চাইত তবে হুযূর নিষেধ করতেন এবং বলতেন, এভাবে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিলে বা চিৎকার করলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। মৃদু স্বরে ডেকে ওঠাবে।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই অন্য একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনিও আবার এই বর্ণনাটি শুনেছেন মৌলভী রহিম বখশ সাহেবের কাছে; তাঁর পিতা ঘরের বাইরের অংশে চৌবারায় (ওপরের কক্ষে) অবস্থান করতেন। সেখানেই তাঁর জন্য খাবার যেত। যে খাবারই আসত, তা তিনি খেয়ে নিতেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৯)

মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিষয়ে বলছেন, আব্বাজান বাইরের চৌবারায় থাকতেন; বাইরে যে একটি কামরা ছিল, সেটিতে অর্থাৎ দোতলায় তিনি থাকতেন। আর সেখানেই তাঁর জন্য খাবার যেত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে যুগে রোযা রেখেছেন তখনও খাবার যেত যা তিনি দরিদ্রদের মাঝেবিলিয়ে দিতেন। যাহোক তিনি বলেন, খাবার সেখানে যেত এবং যে ধরনের খাবারই যেত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেটি খেয়ে নিতেন, কখনো কিছু বলতেন না।

তাঁর (আ.) দাবির পূর্বের একটি ঘটনা জামা'তের ইতিহাসে খুবই বিখ্যাত। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব সবে মৌলভী ও আলেম হয়ে দিল্লি থেকে বাটালা ফেরত আসলে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সে যুগে বিভিনড়ব বিষয়ে ধর্মীয় বিতর্ক করার প্রচলন ছিল মুকাল্লিদিন ও গায়ের মুকাল্লিদিনদের মাঝে। মুকাল্লিদিন তারা, যারা কোনো না কোনো ফিকাহর ইমামের অনুসারী; যেমন- হানাফী, মালেকী প্রভৃতি। আর যারা কোনো ফিকাহর আলেমের অনুসারী নন তাদেরকে গায়ের মুকাল্লিদিন বলা হয়; যেমন- আহলে হাদীস প্রভৃতি। বাটালার অধিবাসীরা যখন এই আলোড়ন হট্টগোল দেখল তখন তাদের দৃষ্টি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য হযরত আকদাস (আ.)-এর ওপর পড়ল। তাদের নিশ্চিত ধারণা ছিল, একমাত্র তিনিই (আ.) এই যুবক মৌলভীর মুখ বন্ধ করতে পারবেন। অনেক কষ্টে তাঁকে (আ.) এই বিতর্কে রাজি করানো হয়। তিনি (আ.) প্রথমে রাজি ছিলেন না। যাহোক, লোকজনের পীড়াপীড়িতে তিনি সম্মত হন। তাঁকে (আ.) বিতর্কের জন্য নিয়ে আসা হয়। উভয়পক্ষের সমর্থকদের একটি বড়ো অংশ একত্রিত ছিল। উভয়পক্ষের সমর্থকরা একত্রিত হয়। সেদিন বিশেষভাবে মুকাল্লিদিন দলটি নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল আর তাদের আশা যথার্থ ছিল। কেননা, আজকে এই বিশিষ্ট আলেমকে বিতর্কের জন্য আনা হয়েছে। মুকাল্লিদিনদের ধারণা ছিল, আজকে আমরা অবশ্যই বিজয়ী হবো কেননা আজ হযরত মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এসেছেন। এর কারণ হলো, তাঁর পাকড়াও এত দৃঢ় হতো যে, প্রতিপক্ষ জালে আবদ্ধ চড়ুইয়ের মতো নিরুপায় হয়ে যেত।

যাইহোক, তিনি (আ.) যখন বিতর্কস্থলে পৌঁছালেন তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ ও বিশ্বাস কী- সেগুলো উপস্থাপন করুন যেন খণ্ডন করা যায়। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব বললেন, আমার মতে পবিত্র কুরআনের স্থান সর্বাগ্রে, এরপর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ও হাদীস, যে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। হযরত আকদাস (আ.) মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে তার বিশ্বাস সম্পর্কে শুনে বলেন, আমার মতে আপনার মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোনো আপত্তিকর বিষয় নেই যেটি খণ্ডন করা যেতে পারে। যারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ধারণা ছিল, এটিতো আমাদের পরাজয় গণ্য হবে আর প্রতিপক্ষ নিজেদের বিজয়ের ডঙ্কা বাজাবে। তিনি সোজাসাপ্টা মৌলভী সাহেবকে বলে দিয়েছেন, আমি তো কোনো আপত্তিকর বিষয় দেখি না। তাই যা-ই হোক না কেন, মৌলভী সাহেবকে এই বিতর্কে কিছুটা লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন করতে হবে। তাদের কিছুটা হলেও পরাজয়ের গ্লানি সওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আকদাস (আ.) জয়-পরাজয়ের গর্ব ও লাঞ্ছনার উর্ধ্বে থেকে পরম বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে সেখান থেকে ফিরে আসেন।

হযরত আকদাস (আ.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, ১৮৬৮ অথবা ১৮৬৯ সালেও উর্দুতে একটি বিস্ময়কর ইলহাম হয়েছিল যেটি এখানে লেখা সমীচীন হবে। এই ইলহামের উপলক্ষ্য ছিল, মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী যিনি কোনো এক যুগে এই অধমের সহপাঠীও ছিল, যখন নতুন নতুন মৌলভী পাশ করে বাটালা আসেন, আর বাটালার অধিবাসীদের কাছে তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শ অপছন্দনীয় ঠেকে, তখন একজন ব্যক্তি উল্লিখিত মৌলভী সাহেবের সাথে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মুবাহাসার জন্য এই অধমকে বাধ্য করে। তার কথায় এই অধম সন্ধ্যাবেলা সেই ব্যক্তির সাথে উল্লেখিত মৌলভী সাহেবের বাড়িতে যায় এবং মৌলভী সাহেবকে তার পিতাসহ মসজিদে পায়। তারপর সংক্ষেপে, এই অধম মৌলভী সাহেবের সেই সময়ের বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারে যে, তার বক্তৃতায় এমন কোনো বাড়াবাড়ি নেই যা আপত্তিজনক হতে পারে। তাই শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরে বিতর্ক পরিত্যাগ করে। রাতে খোদা তা'লা তাঁর ইলহাম ও কথোপকথনে এই বিতর্ক পরিত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে অশেষ বরকত দান করবেন, এমনকি বাদশাগণও তোমার পোশাকে বরকত অন্বেষণ করবে। এরপর কাশফে সেই বাদশাদের দেখানো হয় যারা ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। যেহেতু কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের খাতিরে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই অনুগ্রহের সেই মূর্ত প্রতীক আল্লাহ্ চান নি যে, বিষয়টিকে বিনা পুরস্কারে ছেড়ে দেবেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রুহানী খাযায়েন ১ম খণ্ড, পৃ: ৬২১-৬২২)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব এই ঘটনাটি তাঁর পুস্তক 'হায়াতে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন এবং এর ওপর একটি টীকাও লিখেছেন।

তিনি লেখেন, লোকেরা বিতর্কের সাধারণ রীতি ও বিতর্ককারীদের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। নিজের প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষের কথা যদি সঠিক হয়- তা মেনে নেওয়া এবং জনসমক্ষে স্বীকার করা খুবই কঠিন। আমি আলেমদের অবমাননা করছি না; কিন্তু আলেমদের জন্য প্রাণ দেওয়া সহজ, তবে নিজের ভুল তো দূরের কথা, প্রতিপক্ষের সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নেবার অভ্যাসটুকুও হারিয়ে গেছে। আজও একই অবস্থা। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির রঙে রঙিন ছিল। আর এটিও জানা বিষয়, তিনি স্বভাবতই পছন্দ করতেন না যে, মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্কলহ থাকবে এবং তারা মতবিরোধের কারণে সত্যের সন্ধান ও সত্যবাদিতা ছেড়ে দেবে। আর এটি কতটা সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রমাণ যে, যার সাথে বিতর্ক করতে যাচ্ছেন, তার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন, তার জ্ঞান ও প্রভাবের কারণে মনে কোনো বাধা বা দ্বিধা নেই। কিন্তু তার মুখ থেকে একটি সত্য কথা শুনে এ কথার মোটেও পরোয়া করছেন না যে, লোকেরা কী বলবে! তারা একে পলায়ন বলবে নাকি প্রতিপক্ষের কাছে ভীত হওয়া বলে অভিহিত করবে। যে কথা সত্য ছিল, তা মেনে নিলেন। যা সত্য ছিল তা স্বীকার করে নিলেন। তিনি কোনো পরোয়া করেন নি যে, লোকেরা কী বলে; আর তার সঠিক হওয়াকে নিজের স্বীকৃতি দ্বারা সত্যায়িত করলেন। এটি এমন একটি কাজ যার উদাহরণ নবীদের এবং তাঁদের বিশেষ অনুসারীদের বাইরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রবৃত্তি ও কামনাকে চূর্ণ করার শক্তিশালী প্রেরণা কেবল মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই লাভ হতে পারে। অতঃপর এই কাজের গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন তখনই প্রকাশিত হলো এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইলহামের মাধ্যমে সুসংবাদ দিলেন এবং যেন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট- এর সনদ দান করলেন। মানুষ চায় পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাক এবং লোকেরা তার প্রতি মনোযোগী হোক। আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের ফলস্বরূপ জানালেন, বাদশাগণও তোমার পোশাকে বরকত অন্বেষণ করবে। এটি সেই যুগের কথা যখন কিনা 'বারাহীনে আহমদীয়া' রচনার চিন্তাও করা হয় নি, (মাহদী হবার) দাবি তো দূরের কথা। তিনি যেন জগতের প্রতি সম্পর্কহীনতার মাঝে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবন-জীবিকার চিন্তা যদিও তাঁর মনমস্তিষ্কে প্রভাব ফেলতে পারে নি, তবে পরিবারের লোকেরা অবশ্যই ভাবত যে, তিনি কী করবেন। তখন ইলহাম হয়, বাদশাগণ বরকত অন্বেষণ করবে, যখন কিনা তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। তাঁর পিতা মহোদয় তখন জীবিত ছিলেন। মোদ্দাকথা, জীবনের সেই স্তরে ছিলেন যেখানে একজন বস্তুবাদী মানুষ বড়ো বড়ো আশায় বুক বাঁধে এবং বয়সের সেই অংশ যখন সব ধরনের চিন্তাভাবনা ও আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রদর্শনের আবেগ থাকে প্রবল। নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে জেদ ও হঠকারিতা কাজ করে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত মির্যা সাহেব একজন বিখ্যাত মৌলভীর সাথে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য যান এবং তার বক্তব্য শোনার পর সেগুলোকে সঠিক দেখে তার সত্যায়ন করেন। লোকেরা কী বলবে- সে বিষয় নিয়ে তিনি আদৌ চিন্তা করেন নি, কিংবা এ বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নি যে, এই ব্যক্তি কিছু বিশ্বাসের কারণে ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন আর আমি আমার কথার মাধ্যমে তাকে সমর্থন করছি; আমার বিরুদ্ধেও বিরোধিতার ঝড় উঠতে পারে। সুতরাং ভেবে দেখুন, এই পরিস্থিতিতে যখন হানাফী ও গায়ের মুকাল্লিদদের মাঝে এক ভয়াবহ লড়াই চলছিল, আর এমন সময় একজন আহলে হাদীসকে সমর্থন করার অর্থ হচ্ছে অগণিত বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো, (তখন) হযরত মির্যা সাহেব মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে সমর্থন করেন; অথচ তাঁকে ডাকা হয়েছিল তার সাথে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য।

এটা ভাবা বা একথা মনে করা চরম বোকামি হবে যে, মৌলভী আবু সাঈদ সাহেবের জ্ঞানের জোর তাঁকে অর্থাৎ মির্যা সাহেবকে এখানে চুপ করিয়ে দেওয়ার কারণ ছিল। যদি পরবর্তী যুগে তিনি (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন

বাটালভীর সাথে বক্তৃতা ও লিখিত বিতর্ক না করতেন এবং এই ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুহাম্মদ (সা.)-এর এই সাহসী বীর না আসতেন, তাহলে এই কল্পনা কিছুটা হলেও যৌক্তিক হতো। এ ধারণা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, মির্যা সাহেব সেই সময়ে কোনোভাবে ভীত ছিলেন। কারণ পরবর্তীকালের ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কয়েকবার মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তাকে ডেকে বলেছেন, তিনি কী ভুল করছেন এবং কী সঠিক করছেন। তিনি আরো লিখেছেন, কোনো অবস্থাতেই এক সেকেন্ডের জন্যও তার জ্ঞান ও তার ভয় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর ছিল না। এগুলোই সেসব ঘটনা যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে, এহেন চিন্তা অজ্ঞতা বৈকি। বরং এর মূলে একটি শুধু একটি বিষয়ই কার্যকর ছিল, আর তা হলো ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। ধর্মের ব্যাপারে নিষ্ঠা ছিল, তাই সেই সময়ে তিনি তা স্বীকার করেছিলেন।" (হায়াতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯১-২৯২)

কিন্তু মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর ভয়ে তা করেন নি, কারণ পরবর্তীকালে তিনি তাকে বহুবার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং তাকে (বিতর্কে) আমন্ত্রণও জানিয়েছেন এবং তাকে সঠিক পথে আসার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে লেখা একটি পত্রে মির্যা সাহেব তাকে সত্যের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্পর্কে পরম বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন:

"আমার সেবাধন্য আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মৌলভী সাহেব, সাল্লামাহু তা'লা। আপনার পত্র পেয়েছি। এতে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'ও লেখা ছিল। এই অধমের জন্য সমস্যার কথা হলো, স্বাস্থ্য প্রায়ই হঠাৎ করে এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, মৃত্যু আসনড়ব মনে হয় এবং কিছু অসুস্থতা দিনরাত লেগে থাকে। বেশি কথা বললে অসুস্থতার প্রকোপ শুরু হয়। বেশি চিন্তা করলেও একই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। আপনার শেষ পত্রটি এসেছে, মনে হয় পত্রটি মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবসহ লিখেছেন, অর্থাৎ আপনারা দুইজন মিলে পত্রটি লিখেছেন। তাই উত্তর এভাবে লেখা হচ্ছে যে, এই অধম বর্তমানে রোগের আধিক্যের কারণে পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ছে। মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে বিতর্ক করার শক্তি এখন আমার নেই। এই মুহূর্তে আলোচনায় অংশ নেওয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই এই তিনটি গ্রন্থ- অর্থাৎ তিনি (আ.) যে পুস্তক তিনটি রচনা করেছিলেন- ফতেহ ইসলাম, তৌযিহে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম; এগুলো এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, অধিকাংশ সময় অন্য কেউ আমার কথা লিপিবদ্ধ করে নিত আর নিজের হাতে কিছু লেখা আমার পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। বইয়ের বাক্যগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংশোধন করার মতো সময়ও আমার নেই। মৌলভী সাহেবকে তিনি লেখেন, হাদীসের বিষয়ে আপনার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক। আমি তো কেবল এই তিনটি বই লিখেছি, অথচ হাদীস বিষয়ে আপনার জ্ঞান অত্যন্ত সুপরিসর, আপনি একজন বড়ো আলেম; আর এ অধম একজন নিরক্ষর ও অজ্ঞ মানুষ মাত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে নিজেকে নিরক্ষর ও অজ্ঞ বলেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি বলে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করছেন যে, না কোনো ইবাদত আছে, না আছে আধ্যাত্মিক সাধনা, না কোনো জ্ঞান আছে, না আছে যোগ্যতা। মোটকথা, কোনোকিছুই আমার নেই। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ ছিল, যা ছিল অকাট্য ও সুনিশ্চিত। এই অধম তা পৌঁছে দিয়েছে মাত্র; এখন তা মেনে নেওয়া বা না মানা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার ও বিবেচনাবোধের ওপর নির্ভরশীল।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ১খণ্ড, পৃ: ৩১৯-৩২০)

তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাকে তবলীগও করেছিলেন।

হযরত মুন্সি আহমদ জান সাহেবের নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি প্রকাশিত চিঠি রয়েছে, তাতেও তাঁর বিনয় ও নম্রতার উল্লেখ রয়েছে। তিনি (আ.) লেখেন, "আপনার পত্রটি হস্তগত হলো। মহান আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই, যিনি এ অধম বান্দার জন্য এমন আন্তরিক সুহৃদ জুটিয়ে দিয়েছেন, যাঁদের অস্তিত্ব এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ। পরম দয়ালু আল্লাহ্ আপনাকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন এবং আপনার আন্তরিক সদিচ্ছার উত্তম প্রতিদান দিন। এ অধম নিতান্ত অকর্মণ্য ও তুচ্ছ; আর এটি সম্পূর্ণভাবে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র পরম কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি এই অযোগ্য বান্দার ওপর কোনো প্রকার যোগ্যতা ছাড়াই অফুরন্ত রহমতের বারিধারা বর্ষণ করে চলেছেন, রহমতের অজস্র বৃষ্টি বর্ষণ করছেন। তিনি ত্রুটির পর ত্রুটি দেখতে পান, তবুও অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করে যান; অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেন, তবুও পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপালু। এমন ভাষা আমি কোথায় পাই যা দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি! এ অধম অতি নগণ্য, তুচ্ছ, সম্বলহীন এবং পুরোপুরি নিঃস্ব। তিনি আমাকে ধূলায় পেয়ে ওপরে তুলে নিয়েছেন; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ভূপাতিত অবস্থায় পেয়ে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমাকে নিতান্তই অযোগ্য দেখে আমার দোষত্রুটি গোপন রেখেছেন। আমার দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি নিজে আমাকে শক্তি দান করেছেন এবং আমার অজ্ঞতা দেখে আমাকে স্বীয় জ্ঞান দান করেছেন। সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত; অর্থাৎ আমার কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌রই দান করা। আমার প্রতি তিনি এমন সব অনুগ্রহ করেছেন যা আমি গণনা করে শেষ করতে পারব না। আর তাঁর অনুগ্রহের অন্যতম একটি বিকাশ হলো, তিনি আপনার মতো পুণ্যবান ভাইদের অন্তরে এ অধমের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহরাজির সাথেই এটি সম্পর্কিত যে, তিনি এই সবকিছুকে আরও সমৃদ্ধি দান করবেন এবং সেসব মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, যারা এই সিলসিলায় সম্পৃক্ত হয়েছেন।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫-২৬) অর্থাৎ যারা এখন আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উন্নতি দান করবেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব এই চিঠিটি প্রকাশ করার সময় তার একটি নোটে লিখছেন, এই চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সীমাহীন ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর বিনয়, দীনতা ও নম্রতার পরম পরাকাষ্ঠাও এতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এসব অনুগ্রহ ও পুরস্কারের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধ্বনিত হচ্ছে।" (মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মসীলে মসীহ্ হবার দাবি করেন তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। অত্যন্ত অহংকারের সাথে এবং চরম অশোভন শব্দ ও সম্বোধনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চিঠি লিখতে শুরু করেন। এমনকি নিজের 'ইশায়াতুস সুনড়বাহ' নামক পত্রিকায়ও তিনি সৌজন্যবহির্ভূত ভাষা প্রয়োগ করতে থাকেন এবং ঘোষণা করেন, এটি একটি ফিতনা এবং আমি এই জামা'তকে তছনছ করে দেবো। তিনি একথাও লেখেন যে, আমি যেভাবে তাকে আকাশে উঠিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই এখন মাটিতে নামাবো। অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্) মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বলতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি প্রশংসার মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আকাশে উঠিয়েছিলেন এবং এখন তিনিই তাকে নীচে নামিয়ে ছাড়বেন।"

(সূত্র: ইশাআতুস সুন্নাহ পত্রিকা, প্রকাশকাল-১৮৯০, নং ১, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩-৪))

মৌলভী সাহেবের ধারণা ছিল যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া'র বিষয়ে তার লিখিত রিভিউ মূলত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক উচ্চাসনে সমাসীন করেছিল; কিন্তু এসব কটুকথা, অহংকারসূচক বাক্যালাপ এবং চিঠিপত্রের জবাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করেছিলেন, যা মসীহ্ নাসেরীর [তথা হযরত ঈসা (আ.)-এর] ধৈর্যকেও হার মানায়।

এখানে মৌলভী সাহেবের নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কেবল একটি চিঠি উপস্থাপন করা হলো, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার কটু ভাষা ও অহংকারের বিপরীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অন্তরে সহানুভূতি, হিতাকাঙ্ক্ষা ও বিনয়-নম্রতার এক মহাসমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল। বস্তুত তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করে লেখেন,

"আপনার চিঠি পেয়েছি। যদিও আল্লাহ্ তা'লা ভালো করেই জানেন, এই অধম তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং এমন সব বিষয়ে- যেখানে সাধারণ মানুষের মাঝে নৈরাজ্যের আশঙ্কা থাকে- যতক্ষণ না কাজটি সম্পূর্ণ অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে এ অধমের ওপর প্রকাশ করা হয়, ততক্ষণ আমি তা কখনোই মুখে আনি না। তবে এতে মহান আল্লাহ্‌র কোনো হিকমত বা প্রজ্ঞা নিশ্চয় থাকবে। মসীহ্‌র অবতরণের বিষয়ে- যার সাথে ইসলামের মূল বা সারবস্তুর সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই এবং একজন মুসলমানের ওপর এর প্রকৃত তাৎপর্য উন্মোচন করা হয়েছে, যার প্রতি ভাই হিসেবে সুধারণা পোষণ করা উচিত ছিল- কিন্তু সেই বিষয়ে আপনাকে একটি বিরোধিতামূলক লেখার জন্য এটি প্ররোচিত করেছে। প্রথম কথা হলো, আমি যদি বলি- ঈসা ইন্তেকাল করেছেন, তবে একজন মুসলমান হিসেবে আপনাদের তো আমার সমর্থন করা উচিত ছিল; কিন্তু আপনারা বিরোধিতামূলক কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি জানি, এতে আপনার নিয়্যত বা উদ্দেশ্য ভালোই হবে; হয়ত ভালো নিয়্যত নিয়েই এমনটা করেছেন। আমার হৃদয়ে আপনার এই তাড়াহুড়ার ব্যাপারে অভিযোগ থাকলেও, আর আমি তা আপনার সামনে কিংবা আপনার অনুপস্থিতিতে যদি প্রকাশও করি, তবুও আপনার নিয়্যতের প্রতি আমার সুধারণা রয়েছে। আমি আপনাকে বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলেম, বরং আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আল্লাহ্‌র খাতিরে ধর্মীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলভী নযীর হোসেনের চেয়েও উত্তম মনে করি। আর

শেষাংশ ১২ পাতায়......

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ জুন, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৫ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার বিভিন্ন ঘটনা বা তাঁর (আ.) উপদেশমালা বর্ণনা করেছিলাম। আজও এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা এবং তাঁর (আ.) বিভিন্ন উপদেশ উপস্থাপন করব।

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উত্তম চরিত্রের মান এমন ছিল যে, কাদিয়ানের যেসব মানুষ সর্বদা তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে থাকত এবং বিরোধিতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতো না, তারাও যখন তাঁর (আ.) বাড়িতে আসত এবং কড়া নাড়ত, তখন আমি দেখেছি, তিনি (আ.) খালি পায়েই বাইরে আসতেন। আর দেখামাত্রই অত্যন্ত স্নেহ ও দয়ার সাথে তাদের সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনি ভালো আছেন তো?' এরপর তাদের বাড়ির সবার অবস্থা জিজ্ঞেস করে তিনি (আ.) বলতেন, 'কী মনে করে এসেছেন?' তারপর যখন সে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা বলত, তখন তিনি (আ.) জিজ্ঞেস করতেন, 'কতটুকু প্রয়োজন?' এরপর তিনি (আ.) তাদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি এনে দিতেন এবং বলতেন, 'যদি আরও প্রয়োজন পড়ে তাহলে আরও নিয়ে যাবেন।'

(আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬)

শত্রুদের প্রতিও তাঁর (আ.) ব্যবহার ছিল অনেক উন্নত মানের এবং তাদের সাথেও তিনি (আ.) সর্বদা পরম বিনয়সুলভ ব্যবহার করতেন, কখনও অহংকার প্রদর্শন করেননি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.)-র কাছ থেকে এই ঘটনাটি শুনেছেন এবং মৌলভি শের আলী সাহেব (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, মীরাঁ বখশ প্রতিবন্ধি নামক মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি ছিল। একবার বড়ো মসজিদ থেকে আসার সময় সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নাম ধরে ডাক দেয়। [অর্থাৎ, চরম বেয়াদবির সাথে নাম ধরে ডাকে।] যাহোক, তার বুদ্ধি ছিল না তাই এভাবেই তার নাম নেয়ার কথা ছিল। সে বলতে থাকে, 'ওহে গোলাম আহমদ!' তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, "জী।" তিনি (আ.) কিছু মনে না বলেন বলেন, "জী, কী বলতে চান?" সে বলে, 'সালাম তে আখিয়া কর' অর্থাৎ, পাঞ্জাবিতে সে বলে, 'আগে সালাম তো করো।' সে বেচারা আপন মনে নিজেকে একজন অফিসার মনে করত। তিনি (আ.) বলেন, "আসসালামু আলাইকুম।" তারপর সে বলে, 'মামলা পরিশোধ করো।' সেখানে জমিদারদের মধ্যে মামলা বা খাজনা প্রদান করা হতো, যা সরকারের পক্ষ থেকে একটি ট্যাক্স ছিল। যাহোক, হুযূর (আ.) তার কথা শুনে পকেট থেকে রুমাল বের করে তা থেকে চার আনা বা আট আনা তাকে দিয়ে দেন। সে খুশি হয়ে 'ঘোড়িয়াঁ' গাইতে গাইতে চলে যায়। " (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৩৪)

'ঘোড়িয়াঁ' হলো প্রশংসামূলক পঙক্তি। মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তির কথায়ও তিনি (আ.) কখনও রাগ করতেন না বরং তার জন্যও দাঁড়িয়ে যেতেন।

মাস্টার নযীর হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখনই আমি আমার পিতার সাথে কাদিয়ানে হুযূরের কাছে আসতাম এবং হুযূরকে সংবাদ দেয়া হতো যে, 'হাকীম মারহামে ঈসা সাহেব এসেছেন', তখন আমি সবসময় এটিই দেখেছি যে, হুযূর সংবাদ পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ বাইরে আসতেন। আর সেসময় খাওয়ার জন্য কিছু না কিছু পরিবেশন করতেন; আবার কখনও কখনও এমনও হতো যে, তিনি (আ.) নিজেই গিয়ে খাবার নিয়ে আসতেন।

তিনি লেখেন, হুযূর এতই সাধারণ এবং সাদামাটাভাবে অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন যে, আমি অনেক সময় হুযূরকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, হুযূরের হাতে কলম থাকত এবং কখনও কখনও হুযূর খালি পায়েই বাইরে আসতেন।

ঘরের কামরায় যেভাবে বসে থাকতেন, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলে ঠিক সেভাবেই বাইরে চলে আসতেন। আর কখনও যদি হুযূর মসজিদে বসে থাকতেন এবং কোনো অতিথি আসত, তাহলে হুযূর অধিকাংশ সময় উঠে দাঁড়িয়ে তার সাথে করমর্দন করতেন। আর যদি হুযূর কারো সাথে অন্য কোনো কথায় মগ্ন থাকতেন এবং এমন সময় কেউ এসে যেত এবং হুযূরের কাছে বসে করমর্দন করতেন, তবে হুযূর তৎক্ষণাৎ তার প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং তার অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতেন। সারকথা হলো, হুযূর পরম বিনয়ের সাথে তার কাছে আগতদের অভ্যর্থনা জানাতেন।

(আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৩)

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। সম্ভবত এটি ১৮৯৭ বা ৯৮ সালের ঘটনা হবে। হযরত সাহেব আমাকে মসজিদে মুবারকে বসান। তখন এটি ছোটো মসজিদ ছিল। তিনি (আ.) বলেন, "বসুন, আমি খাবার নিয়ে আসছি।" এ কথা বলে তিনি (আ.) ভেতরে চলে যান। আমার ধারণা ছিল, তিনি হয়তো কোনো সেবকের হাতে খাবার পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু কয়েক মিনিট পর যখন জানালা খোলা হয়, তখন আমি দেখতে পাই, তিনি (আ.) নিজ হাতেই সিনি অর্থাৎ বড় প্লেট বা থালাতে খাবার সাজিয়ে ট্রেতে করে আমার জন্য নিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে তিনি (আ.) বলেন, "আপনি খাবার খান, আমি পানি নিয়ে আসছি।"

তিনি বলেন, আবেগের আতিশয্যে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে যে, হযরত (আ.) আমাদের অনুসরণীয় ও নেতা হয়ে যেখানে আমাদের এমন সেবা করছেন, সেখানে আমাদের নিজেদের পরস্পরের কতবেশি সেবা করা উচিত?

(যিকরে হাবীব, রচয়িতা-হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ২৫৮)

তাঁর (আ.) সরলতা ও বিনয়ের একটি রেওয়ায়েত হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'মাঈ ভোলী' ('মাঈ জীওয়াঁ') নামক মহিলার বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) গ্রামে আগমন করলে আমি নতুন 'কনক' অর্থাৎ গম ভেজে নিয়ে যাই। সেই গ্রাম, যেখানে তিনি গিয়েছিলেন। তিনি (আ.) তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের মাঝে তা বণ্টন করে দেন। নিজেও একটু চেখে দেখেন এবং খুশি হন। আর হুযূর (আ.) যখনই ভ্রমণে আসতেন, তখন আমাদের মাটির মসজিদে এসে ইশরাকের নামায পড়তেন। আমরা শাক-রুটি পরিবেশন করতাম, হুযূর (আ.) কখনও তা খারাপ মনে করেননি এবং কোনো বিরক্তিও প্রকাশ করেননি, বরং অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন।

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ২০২, রেওয়ায়েত নং ১৩১৮)

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) কপুরথলভী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত সাহেব (আ.) তাঁর বসার জায়গায় কখনো দরজা খোলা রেখে বসতেন না, বরং সবসময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত সাহেবযাদা মিয়াঁ মাহমুদ সাহেব একটু পরপর এসে বলতেন, 'আব্বা, ছিটকিনি খুলুন' এবং হযরত সাহেব (আ.) উঠে তা খুলে দিতেন। একবার আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হই। তখন হুযূর (আ.) একটি চাটাইয়ের ওপর বসেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি (আ.) একটি খাট তুলেন এবং ভেতরে নিয়ে যান। আমি বলি, 'হুযূর, আমি তুলে নিচ্ছি।' তিনি (আ.) বলেন, "এটি অনেক ভারী, আপনি তুলতে পারবেন না।" এরপর বলেন, "আপনি খাটে বসুন।" [তিনি (আ.) খাটটি তুলে সেখানে নিয়ে যান এবং তাকে বসান।] আর নিজের সম্পর্কে বলেন, "আমার এখানে নীচেই আরাম লাগছে, আমি নীচেই বসব, আপনি খাটে বসুন।" তিনি বলেন, প্রথমে তো আমি অস্বীকৃতি জানাই, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, "আপনি অসংকোচে বসে পড়ুন।" তারপর আমি বসে পড়ি। আমার তৃষ্ণা পেয়েছিল। আমি কলসিগুলোর দিকে তাকাই, কিন্তু সেখানে পানি পান করার মতো কোনো পাত্র ছিল না। তিনি (আ.) আমাকে দেখে বলেন, "আপনার কি তৃষ্ণা পেয়েছে? আমি পানি নিয়ে আসছি।" এরপর নীচে অন্দরমহল থেকে গিয়ে তিনি (আ.) একটি গ্লাস নিয়ে আসেন। তারপর বলেন, "একটু অপেক্ষা করুন।" তিনি আবার নীচে যান এবং সেখান থেকে শরবতের দুটি বোতল নিয়ে আসেন, যা মনিপুর থেকে কেউ পাঠিয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, শরবত অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল। তিনি (আ.) বলেন, "এই বোতলগুলো অনেক দিন ধরে রাখা ছিল, কারণ আমি নিয়্যত করেছিলাম, প্রথমে কোনো বন্ধুকে পান করাব, তারপর নিজে পান করব। আজ মনে পড়ে গেল।" অতএব তিনি (আ.) গ্লাসে শরবত বানিয়ে আমাকে দেন। [অর্থাৎ, যে উপহার এসেছিল, সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলছিলেন, 'প্রথমে আমি কোনো বন্ধুকে পান করাব, তারপর আমি পান করব।'] তিনি (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'প্রথমে হুযূর এ থেকে সামান্য একটু পান করুন।' [তাকে যখন গ্লাসে শরবত বানিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেন, 'প্রথমে আপনি পান করুন, তারপর আমি পান করব।'] তিনি (আ.) এক ঢোঁক পান করে আমাকে দিয়ে দেন এবং আমি তা পান করি। আমি শরবতের প্রশংসা করি। তিনি (আ.) বলেন, "একটি বোতল আপনি নিয়ে যান এবং অন্যটি বাইরে থাকা বন্ধুদের পান করান।" তিনি (আ.) হয়তো সেই দুই বোতল থেকে ওই একটি ঢোঁকই পান করেছিলেন। আমি তাঁর (আ.) নির্দেশ অনুযায়ী বোতলগুলো নিয়ে চলে আসি।"

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৮-১৬৯)

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আহমদ জান সাহেবের কন্যা আয়েশা সাহেবা বর্ণনা করেছেন, ১৯০৬ সালে যখন আমার প্রয়াত মাতা ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আম্মা জী অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র স্ত্রী আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। নাস্তা ইত্যাদি করান। তারপর চার-পাঁচ দিন পর হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। তিনি ওই জায়গার কথা বলছেন, ওপরে যেখানে রান্নাঘর আছে- সেখানে আম্মাজান তাঁর ঘরে (আমার) মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তখন একজন মহিলা আমার মাথায় পানি ঢালছিলেন এবং আম্মাজান এই মেয়েটির, [যার মা ইন্তেকাল করেছিলেন] মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। আর তিনি বলেন, হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) আমার মাথায় সাবান মেখে ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ওই মহিলাটি বেশি পানি ঢালছিলেন। হুযূর (আ.) সেখানে পায়চারি করছিলেন। তিনি এটি দেখে ওই মহিলার হাত থেকে বদনাটি নিয়ে আমার মাথায় পানি ঢালতে শুরু করেন। তিনি (আ.) আস্তে আস্তে পানি ঢালতে থাকেন এবং হযরত আম্মাজান অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) চিরুনি দিয়ে (আমার মাথা) আঁচড়াতে থাকেন। হুযূর (আ.) বলছিলেন, "এভাবে উকুন চলে যাবে।"

(সীরতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

হতে পারে মাথায় উকুনও হয়ে গিয়েছিল, কারণ অনেক দিন ধরে তার মা অসুস্থ ছিলেন, তারপর ইন্তেকাল করেন, যত্ন নেওয়ার মতো কেউ ছিল না। যাহোক, একারণে হয়তো উকুন হয়ে গিয়েছিল অথবা সেসব এলাকায় এমনিতেই উকুন হয়ে যেত। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, "এভাবে মাথা ধুয়ে নাও, এভাবে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে থাকো, তাহলে উকুন চলে যাবে।"

ঘরের কোনো কাজে সাহায্য করতেও তিনি (আ.) কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না

মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমি ওযুর জন্য পানির খোঁজে বদনা হাতে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে যাই, যা মসজিদে মুবারক থেকে হযরত সাহেবের বাড়ির ভেতরের দিকে যায়, যেন সেখানে হযরত সাহেবের কোনো সেবককে বদনা দিয়ে ভেতর থেকে পানি আনাতে পারি। ঘটনাক্রমে ভেতর থেকে হযরত সাহেব (আ.) বাইরে আসেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন, "আপনার কি পানি দরকার?" আমি নিবেদন করি, জী হুযূর। হুযূর (আ.) আমার হাত থেকে বদনা নিয়ে নেন এবং বলেন, "আমি এনে দিচ্ছি।" আর তিনি (আ.) নিজে ভেতর থেকে পানি ভরে নিয়ে আসেন এবং আমাকে দেন। (যিকরে হাবীব, রচয়িতা-হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক, পৃ: ২৫৭-২৫৮)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মরহুম ও মগফুর শ্রদ্ধেয় ডা. খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবের স্ত্রী মুরাদ খাতুন সাহেবা বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) এবং সবাই মিলে আম খান। [আমের মৌসুম ছিল, সেই যুগে চুষে খাওয়ার আম বেশি হতো।] তাই উঠানে (আমের) খোসা ও আঁটির দুই-তিনটি স্তূপ হয়ে যায়। অনেক মহিলা বসেছিলেন। সেগুলোর ওপর অনেক মাছিও ভন ভন করতে শুরু করে। তারা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন পরিষ্কার করার কথা খেয়াল হয়নি। তিনি বলেন, সেসময় আমিও সেখানে বসেছিলাম, কয়েকজন খাদেমাও উপস্থিত ছিল, কাজ করার মতো গৃহকর্মি মহিলারাও উপস্থিত ছিল। ইতিমধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আসেন এবং তিনি (আ.) তা দেখতে পেয়ে নিজেই একটি বদনায় ফিনাইল নিয়ে পুরো উঠানে (আমের) খোসার স্তূপগুলোর ওপর নিজের হাতে তা ঢেলে দেন, যাতে মাছি ইত্যাদি চলে যায় এবং নোংরা পরিষ্কার হয়। কোনো দুর্গন্ধ না আসে। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬১)

কাউকে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের কাজের মাধ্যমেই দেখিয়ে দেন যে, ময়লা-আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করা উচিত। এতে একদিকে যেমন তাঁর (আ.) বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়, তেমনি অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিধির প্রতি তাঁর (আ.) মনোযোগও পরিলক্ষিত হয়।

লাহোরের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল, যাদের মাঝে ড. আল্লামা ইকবাল এবং স্যার শাহাব উদ্দীন প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। এই সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করে বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বলেন, রাতে খাবার খাওয়ার পর যখন চারপাই (খাট) বণ্টন করা হয়, তখন আমি একটি মজবুত ও বড়ো চারপাই নেই। কিন্তু চৌধুরী শাহাব উদ্দীন সাহেব, যিনি পরবর্তীতে স্যার শাহাব উদ্দীন নামে পরিচিত হন, সেখান থেকে আমার বিছানা সরিয়ে দিয়ে আমার চারপাইটি দখল করেন। (তখন) হযরত সাহেব (আ.) আসেন এবং সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?" প্রত্যেকেই বলে, হুযূর, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তিনি (আ.) যখন আমার কাছে আসেন, তখন আমি চিন্তিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম, কারণ আমার তক্তপোশ চৌধুরী শাহাব উদ্দীন সাহেব দখল করে নিয়েছিলেন। আমি নিবেদন করি, হুযূর, আমার তক্তপোশটি চৌধুরী শাহাব উদ্দীন কেড়ে নিয়েছে এবং আমি চিন্তায় পড়েছি যে, কোথায় ঘুমাব। তিনি (আ.) বলেন, "অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য তক্তপোশ নিয়ে আসছি।" তিনি বলেন, এরপর হযরত সাহেব (আ.) চলে যান। অনেকক্ষণ পার হওয়ার পরও যখন তক্তপোশ আসে নি। তখন আমি হুযূরের বাড়ির উঠানের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখি যে, এক ব্যক্তি দ্রুত একটি চারপাই বুনছে এবং হুযূর তার কাছে হাতে প্রদীপ নিয়ে বসে আলো দিচ্ছেন। হুযূরের এই অবস্থা দেখে আমি অনেক লজ্জা পাই। আমি এগিয়ে যাই, দরজাও খোলাই ছিল এবং নিবেদন করি, হুযূর! প্রদীপটি আমার হাতে দিন, [এই যে ল্যাম্পটি আমাকে দিন।] কিন্তু হুযূর (আ.) বলেন, "এখন তো মাত্র একবার ঘোরানো (বা বুননের কাজ) বাকি আছে।" হুযূরের এই মহান চরিত্র দেখে আমার ওপর এতটা প্রভাব পড়ে যে, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরে। সেসময় আমি হুযূরের পবিত্র চেহারার দিকে তাকিয়ে বলছিলাম, 'এই চেহারা কখনও কোনো মিথ্যাবাদীর হতে পারে না।' (লাহোর তারিখে আহমদীয়াত, পৃ: ২১৭-২১৮)

খাদেমকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে পায়ে হাঁটতেন

তাঁর (আ.) খাদেম প্রয়াত মির্যা ইসমাঈল বেগ সাহেবের সাক্ষ্য হলো, যখন হযরত আকদাস (আ.) তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশে তাঁর দাবির পূর্বে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য যেতেন, তখন বাহন হিসেবে একটি ঘোড়াও সাথে থাকত এবং সাধারণত আমিও সঙ্গী হতাম। কিন্তু তিনি (আ.) যখন যাত্রা আরম্ভ করতেন, তখন পায়ে হেঁটেই চলতেন এবং আমাকে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে দিতেন। [যে খাদেম ছিল তাকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিতেন, আর নিজে পায়ে হেঁটে যেতেন]। তিনি বলেন, আমি বারবার অস্বীকৃতি জানাতাম এবং নিবেদন করতাম, হুযূর, আমার লজ্জা লাগে। তিনি (আ.) বলতেন, "আমার পায়ে হেঁটে যেতে লজ্জা লাগে না, তোমার বাহনে চড়তে লজ্জা লাগে কেন?" হযরত (আ.) যখন কাদিয়ান থেকে রওয়ানা হতেন, তখন সবসময় প্রথমে আমাকে বাহনে বসাতেন। যখন অর্ধেকের কম বা বেশি পথ অতিক্রম হয়ে যেত, তখন আমি নেমে যেতাম এবং তিনি (আ.) আরোহণ করতেন। আর একইভাবে যখন আদালত থেকে ফিরে আসতেন, তখনও প্রথমে আমাকে (বাহনে) বসাতেন এবং পরে তিনি (আ.) আরোহণ করতেন। তিনি (আ.) যখন আরোহণ করতেন, তখন ঘোড়া যে গতিতে চলত সে গতিতেই চলতে দিতেন, যাতে করে আমি যেহেতু সাথে সাথে হাঁটছি, আমার কোনো কষ্ট না হয়।

(খুতবাতে তৈয়্যাবা, আব্দুল কাদির সাহেব সাবেক সওদাগর মল, পৃ:১৬০

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মৌলভি শের আলী সাহেব (রা.) আমাকে বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যখন মৌলভি মুহাম্মদ আলী সাহেবের কাছ থেকে কোনো কথা ইত্যাদি জানার প্রয়োজন পড়তো, তখন তিনি (আ.) তাকে নিজের কাছে ডাকার পরিবর্তে নিজেই মৌলভি সাহেবের কুঠরিতে, ছোট্ট যে কক্ষটি ছিল, সেখানে যেতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় মৌলভি মুহাম্মদ আলী সাহেব তাঁর (আ.) বাড়ির একটি অংশে বসবাস করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বাড়ির একটি কক্ষ মৌলভি মুহাম্মদ আলী সাহেবকে দিয়ে রেখেছিলেন এবং তার কাজ করার দপ্তরটিও সেই ছোট্ট কুঠরিতেই ছিল, যা মসজিদে মুবারকের সাথে পূর্ব দিকে অবস্থিত।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই তার কাছে চলে যেতেন। আক্ষেপের বিষয় হলো, হুযূরের এই বিনয় ও নম্রতা থেকে মৌলভি সাহেবের যে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল, তা নেননি এবং পরিশেষে তার দম্ভই তার কাল হয়েছে।

আল-হাকাম পত্রিকার সম্পাদক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সরলতার বিষয়ে লিখেছেন, তিনি (আ.) যখন ভ্রমণে বের হতেন তখন কেউ যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে না যায়- এমন কোনো পার্থক্য বজায়ে রাখা হতো না, এমনকি অনেক সময় সম্মানিত সাহাবীদের মনে এই আশঙ্কার উদয় হতো যে, রাস্তা থেকে ধুলোবালি উড়ছে আর হযরত স্বয়ং সবার পেছনে পড়ে আছেন। হাঁটার ফলে ধুলো উড়বে, কাঁচা পথ ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কখনো এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। প্রায়শই এমন হতো যে, পেছন থেকে মানুষের ঢল আসত এবং সম্মানিত হযরতের গায়ে ধাক্কা লাগত, কখনো জুতো খুলে যেত, অর্থাৎ কারো পা লেগে যেত আবার কখনো বা ধাক্কা লেগে লাঠিটি পড়ে যেত। অথচ কখনো কেউ দেখে নি বা শোনে নি যে, তিনি (আ.) এটি নিয়ে সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করেছেন কিংবা নিজের জন্য কোনো বিশেষ প্রটোকলের ব্যবস্থা করেছেন। এটি বলেন নি যে, তোমাদের কি খেয়াল হয় না? মসজিদে বহুবার এমন হয়েছে যে, তিনি সাহাবীদের মাঝে বসে আছেন, এমন সময় কোনো নতুন আগন্তুক এসে সরাসরি মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব কিংবা হযরত হাকীমুল উম্মত (তথা হেকীম নূরুদ্দীন)-এর সাথে প্রথমে মুসাফাহা করত এবং তাদেরকেই মসীহ মাওউদ মনে করত। তখন সেই বুযুর্গ ব্যক্তিরাই লোকজনকে বলতেন, হযরত সাহেব তো ইনি।"

সর্বোপরি, তিনি সর্বদা তাঁর নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র আদর্শকেই নিজ জীবনের পাথেয় বানিয়েছিলেন এবং সেই অনুপম দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭০)

ডাক্তার বাশারত আহমদ সাহেবের একটি বর্ণনা রয়েছে। মালেরকোটলা নিবাসী নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব-এর স্ত্রীর ইন্তেকাল হলে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) জানাযার সাথে কবরস্থানে গেলেন এবং নিজেই জানাযা পড়ালেন। তখনো কবর তৈরি ছিল না। আমিও জানাযার সাথে ছিলাম। উপস্থিত লোকজন কবর দেখায় মগ্ন হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমিও সেদিকে মনোযোগী হলাম। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি হযরত সাহেব অনুপস্থিত অর্থাৎ সেখানে নেই। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখলাম, তিনি বাগানের একপাশে একাকী মাটিতে বসে আছেন। আমি দ্রুত একটি গাছের নীচে একটি সাদা চাদর বিছিয়ে দিলাম এবং হযরতের কাছে বিনীত নিবেদন করলাম, এখানে তীব্র রোদ; ওখানে গাছের ছায়ায় চলুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটিই ঠিক। তিনি গাছের ছায়ায় সেই চাদরের ওপর

গিয়ে বসলেন এবং আমিও তাঁর কাছেই বসলাম। কিছুক্ষণ পর লোকজন যখন দেখল হযরত সাহেব গাছের নীচে বসে আছেন, তখন সবাই সেখানে আসতে শুরু করল। তখন যে-ই আসত, হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) তাকে বলতেন, আসুন আসুন, এখানে বসুন এবং নিজে পেছনে সরে গিয়ে আগন্তুককে চাদরের ওপর বসাতেন। মানুষ আসতেই থাকল আর হযরত সাহেব নিজে পেছনে সরতে সরতে মানুষকে চাদরের ওপর জায়গা করে দিতে থাকলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি দেখলাম, হযরত সাহেব নিজে মাটিতে বসে আছেন আর তাঁর মুরিদরা সবাই চাদরের ওপর বসে আছেন। আগন্তুকদের তো সাক্ষাতের আবেগে কী হচ্ছে অর্থাৎ হযরত সাহেব মাটিতে চলে গেছেন আর আমরা চাদরে বসা- তা খেয়াল করার ফুরসত ছিল না, কিন্তু তিনি বলেন, আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম আর মনে মনে ব্যথিত হচ্ছিলাম। একইসাথে আমার ঈমানও প্রগাঢ় হচ্ছিল যে, খোদা যাকে এত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর অন্তরে কত অসীম বিনয় আর নম্রতা বিরাজমান!" (মুজাদ্দিদে আজম, প্রণেতা- ড. বাশারত আহমদ, ২য় ভাগ, পৃ: ১২৯৩-১২৯৪)

মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব আব্দুল্লাহ আথমের সাথে অমৃতসরে বিতর্ক চলাকালীন সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, সম্ভবত আমরা করীম বখশ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কুঠিতে অবস্থান করছিলাম। তখন কর্নেল আলতাফ আলী খান আমাদের সাথে যোগ দিলেন এবং আমাকে বললেন, তিনি হযরত সাহেবের সাথে একান্তে দেখা করতে চান। কর্নেল সাহেব কোট-প্যান্ট পরিহিত ছিলেন এবং তার দাড়ি-গোঁফ সম্পূর্ণ কামানো অর্থাৎ ক্লিন শেভ ছিল। আমি তাকে বললাম, আপনি ভেতরে চলে যান, আমরা বাইরে থেকে কাউকে ভেতরে যেতে দেবো না। তদনুযায়ী কর্নেল সাহেব ভেতরে গেলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা হযরত সাহেবের সাথে নিভৃতে কাটালেন। তিনি যখন কক্ষ থেকে বাইরে এলেন তখন তার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত ছিল, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী কথা হলো যে, এই দশা? তিনি বললেন, আমি যখন ভেতরে গেলাম তখন দেখলাম হযরত সাহেব আপন ধ্যানে একটি সাধারণ পাটি বা মাদুরের ওপর বসে আছেন, যদিও তাঁর মাত্র একটি হাঁটু পাটির ওপর ছিল আর শরীরের বাকি অংশ ছিল মাটিতে। আমি বিনীতভাবে বললাম, হুযূর! আপনি মাটিতে বসে আছেন? তখন হুযূর সম্ভবত ভাবলেন, কর্নেল সাহেব হয়ত এই সাধারণ পাটিতে বসা পছন্দ করছে না। তাই তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। সাফা এটিকেও(অর্থাৎ পাগড়িকেও বলে আবার কাপড়কেও বলে। অতঃপর বললেন, হয়ত আপনি মাদুরে বসতে চাচ্ছেন না, ঠিক আছে তাহলে এখানে কাপড়ের ওপর বসে যান। কর্নেল সাহেব বলেন, এই অভুতপূর্ব দৃশ্য দেখে আমার চোখে পানি এসে যায়। আমি নিবেদন করলাম, যদিও আমি বিলেতে গিয়ে Baptize হয়েছি অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি এতটা ঈমানশূন্য নই যে, আপনার পবিত্র পাগড়ির ওপর বসব। হুযূর বললেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই, আপনি নিঃসংকোচে বসে যান। অবশেষে আমি সেই পাগড়িটি হাত দিয়ে সরিয়ে মাদুরের ওপর বসলাম এবং নিজের অবস্থা বলা আরম্ভ করলাম যে, আমি প্রচুর মদ পান করি এবং অন্যান্য পাপেও লিপ্ত, আমি খোদা-রসুলের নাম জানি না; কিন্তু আমি এখন আপনার সামনে খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে তওবা করে মুসলমান হচ্ছি। এ সবকিছু হওয়া সত্ত্বেও আমি খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার এ অবস্থা দেখে ও আপনার কথা শুনে আজ আমি খ্রিষ্টধর্ম থেকে তওবা করে মুসলমান হচ্ছি। তবে আমার যে-সব কুঅভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেগুলো পরিত্যাগ করা আমার জন্য কঠিন মনে হচ্ছে।

হুযূর আমাকে বললেন, ইস্তিগফার পাঠ করো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। মানুষের মাঝে যদি খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়, সেক্ষেত্রে এটি একটি ব্যবস্থাপত্র যে, ইস্তিগফার পড়ো এবং নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করো।

তিনি বলেন, যতক্ষণ আমি হুযূরের কাছে বসে ছিলাম, আমার মনের ভেতর এক তুমুল আলোড়ন চলছিল এবং আমি কেবল কাঁদছিলাম। সে অবস্থাতেই আমি ইস্তিগফার ও নামায পড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার করে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নিয়েছি। সেই প্রভাব আমার হৃদয়ে আজও অম্লান। এই কর্নেল সাহেব এ বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন এবং খ্রিষ্টানদের পক্ষে বসতেন, কিন্তু আল্লাহ তা'লা তার নেক স্বভাবের কারণে তার মনে প্রভাব সৃষ্টি করলেন এবং তিনি পুনরায় ইসলামগ্রহণ করলেন।

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১৫০-১৫১)

মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি বর্ণনা করেন, এটি সম্ভবত ১৮৯৬ সালের ঘটনা, কারণ ১৯০০ সালে তিনি এই বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। চার বছর আগের কথা বলছেন যে, বাড়ির লোকজন তখন লুধিয়ানায় গিয়েছিল। জুন মাস ছিল, আর বাড়িটি তখন নতুন তৈরি হয়েছে। দুপুরের দিকে কক্ষের ভেতর বিছানো একটি খাটিয়ার ওপর আমি শুয়ে পড়লাম। হযরত সাহেব তখন ঘরে পায়চারি করছিলেন।

একবার যখন হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল তখন তাকিয়ে দেখি, হযরত সাহেব মেঝের ওপর আমার খাটিয়ার ঠিক নীচে শুয়ে আছেন! আমি আদবের সাথে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। তিনি পরম স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন উঠলেন? আমি নিবেদন করলাম, আপনি নীচে শুয়ে আছেন আর আমি ওপরে কীভাবে শুয়ে থাকতে পারি? তিনি তখন মৃদু হেসে বললেন, আমি তো আসলে আপনার পাহারা দিচ্ছিলাম। এই ছেলেরা বাইরে শোরগোল করছিল, তাই ওদের বারণ করছিলাম যেন আপনার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। (সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.), পৃ: ১৪৭)

হযরত মুন্সি ইমাম দ্বীন সাহেব নিজের বয়আতগ্রহণের সময়কার দৃশ্য বর্ণনা করে বলেন,

"আমি ১৮৯৪ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করি। মাগরিবের নামাযের সময় পর্যন্ত আমার ভাই মুন্সি আব্দুল আযীয সাহেব এবং ভাই জামালুদ্দীন সাহেব সিখোওয়ানি আমার সাথেই ছিলেন। নামায শেষ হবার পর মুন্সি সাহেব হযরত আকদাসের সমীপে আমার দিকে ইঙ্গিত করে নিবেদন করলেন, হুযূর! উনার বয়আত গ্রহণ করুন। হুযূর বললেন, ভেতরে আসুন। আমি যখন একাকী বাইতুল ফিকর-এর ভেতরে গেলাম, তখন হুযূর ঘরের একটি খাটিয়ার পায়ের অংশে বসলেন আর আমাকে খাটিয়ার মাথার দিকে বসার ইশারা করলেন। প্রথমে আমি বসতে সংকোচবোধ করলাম; কিন্তু হুযূর আবার নির্দেশ দিলে আমি বসে পড়লাম। তারপর হুযূর আমার বয়আত গ্রহণ করলেন।

হুযূরের এই আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, কোথায় সেই সব পীর, যাদের সমান্তরালে কেউ বসতে পারে না, আর কোথায় আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুত মসীহ, যিনি এক তুচ্ছ খাদেমকে খাটিয়ার মাথার দিকে বসান, সম্মানজনক স্থানে বসান!

আমার ভাই মুনশি আবদুল আজীজ সাহেব যদিও ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন নি, তবে বাইরে থেকে তিনিও এই দৃশ্য দেখছিলেন।"

(আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২)

হযরত মুনশি জাফর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার মরহুম মুনশি আরোড়া সাহেব এবং আমি লুধিয়ানায় হুযূরের সমীপে নিবেদন করলাম, হুযূর! কখনো সযোগ হলে কপুরথলায় আসুন। কপুরথলায় তখনও রেলপথ পৌঁছে নি। হুযূর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, আমি অবশ্যই সুযোগ হলে আসব। এর কিছুদিন পর ই একদিন হুযূর কোনো পূর্ব-সংবাদ না দিয়েই কপুরথলায় চলে এলেন আর ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে, যে টাঙ্গায় করে এসেছিলেন, ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে কপুরথলার নিকটে অবস্থিত মসজিদ ফতেহওয়ালী যান । হাফেজ আহমদ আলী সাহেব সঙ্গে ছিলেন। মসজিদ থেকে হুযূর সেখানে যে অআহমদী মোল্লা ছিল তাকে "মুনশি অরোড়া সাহেব অথবা মুনশি জাফর আহমদ সাহেবকে আমাদের আগমনের সংবাদ দিয়ে আসো।" তিনি বলেন, আমি এবং মুনশি অরোড়া সাহেব তখন কাচারিতে ছিলাম। আদালতে কাজ করতেন শর্টহ্যান্ড লেখক ছিলেন। তখন সেই মোল্লা এসে সংবাদ দিল যে, "মির্যা সাহেব মসজিদে বসে আছেন এবং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি আপনাদের খবর দিই।" মুনশি অরোড়া সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তির সুরে পাঞ্জাবি ভাষায় বললেন, মিথ্যা বলো না- তোমাদের মসজিদে এসে মির্যা সাহেব ওঠবেন। যাহোক দেখিতো একটু গিয়ে? - মুনশি জাফর সাহেব বলেন। এরপর মুনশি সাহেব দ্রুত তার সাফা অর্থাৎ পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে রওনা হলেন। মসজিদে গিয়ে দেখলেন, হুযূর মেঝেতে শুয়ে আছেন এবং হাফেজ হামিদ আলী সাহেব তাঁর পা টিপে দিচ্ছেন। পাশে একটি পেয়ালা ও একটি চামচ রাখা ছিল। তা দেখে মনে হলো, হয়তো তিনি দুধ পান করেছেন অথবা রুটি ভিজিয়ে খেয়েছেন। এ অবস্থায় মুনশি অরোড়া সাহেব নিবেদন করলেন, "হুযূর, যদি এদিকে আসারই ইচ্ছা থাকলে আমাদের আগে সংবাদ দিতেন। আমরা কারতারপুর স্টেশনে উপস্থিত হতাম।" হুযূর জবাব দিলেন, "সংবাদ দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? আমি তোমাদের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলাম, তা পূরণ করার ছিল, করেছি।"

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১৪১-১৪২)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন- "আমার অবস্থা হলো যদি কারও কোনো কষ্ট হয় আর আমি নামাযে মশগুল থাকি, আর তার আওয়াজ আমার কানে পৌঁছে, তাহলে আমার ইচ্ছা হয় যে নামায ভেঙেও যদি তার কোনো উপকার করতে পারি, তবে তার উপকার করি আর যতদূর সম্ভব, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করি। এটি নৈতিকতার পরিপন্থী যে, কোনো ভাই বিপদ ও কষ্টে পড়লে তাকে সহযোগিতা করা হবে না। তোমরা যদি তার জন্য আর কিছুই করতে না পারো, তবে অন্তত তার জন্য দোয়া করো। আপনজনদের কথা তো বাদই দিলাম, আমি তো বলি যে, পর ও হিন্দুদের সঙ্গেও উত্তম নৈতিকতার নমুনা প্রদর্শন করো এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাও। কখনোই উদাসীন স্বভাবের হওয়া উচিত নয়।"

এটি শুধু উপদেশই নয়; বরং আপনাদের সামনে যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, স্বয়ং তাঁর কর্মপদ্ধতিও এমনই ছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লেখেন "একদা আমি বাইরে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। একজন পাটোয়ারি, আবদুল করিম সাহেব, আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিছুটা সামনে ছিলেন আর আমি পেছনে। পথে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হলো। তার বয়স সত্তর বা পঁচাত্তর বছরের মতো হবে। তিনি সেই পাটোয়ারির কাছে একটি চিঠি পড়ে শোনানোর অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল।" হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "এতে আমি অনেক কষ্ট পাই, পরে আমি তার কাছে গেলাম, তখন সে আমাকে সেই চিঠিটি দিল। আমি তা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং চিঠিটি পড়ে তার অর্থ ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলাম। এতে পাটোয়ারী খুব লজ্জিত হলো; কারণ সেই তো তাকে দাঁড়াতেই হলো আবার পুণ্য থেকেও বঞ্চিত হলো।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, ৪১৫-৪১৬)

সে যদি বিনয়ের সঙ্গে চিঠিটি পড়ে শুনাতো তাহলে সেটাই উত্তম হতো।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন– "খাকসার নিবেদন করছে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎকারীর সব দুঃখ-কষ্ট যেন দূর হয়ে যেত তাঁর হাসিমাখা মুখ দেখে। প্রত্যেক আহমদী অনুভব করত যে, তাঁর সান্নিধ্যে গেলে হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ও বিষণ্ণতা ধুয়ে-মুছে যায়। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে একবার দৃষ্টি পড়লেই সমস্ত শরীরে যেন আনন্দের এক স্রোত বয়ে যায়। তাঁর অভ্যাস ছিল– তিনি কোনো নগণ্য বা অতি সাধারণ ব্যক্তির কথাও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উত্তর দিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি মনে করতো যে, হযরত সাহেব আমাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। অনেক সাধারণ মানুষ, যারা নবী-রসূলগণের মজলিসের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত নয়, তারা দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের অপ্রাসঙ্গিক গল্প-কাহিনি বলতে থাকতো আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নীরবে সেগুলো শুনে যেতেন; কখনো কাউকে এ কথা বলতেন না– 'এখন যথেষ্ট হয়েছে, কথা বন্ধ কর'। (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৭)

একবার একজন ব্যক্তি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মাথা নিচু করে তাঁর পায়ের ওপর নিজ মাথা স্পর্শ করতে চাইলো। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ হাতে তার মাথা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ পদ্ধতি বৈধ নয়, বরং আসসালামু আলাইকুম বলা এবং মুসাফা (করমর্দন) করা উচিত।'(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৬৮)

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা.) লিখেছেন– কাশ্মীরের একজন দীর্ঘকায় দরিদ্র আহমদী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের গ্রাম থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত পুরো পথ হেঁটে আসতেন। তাঁর নাম ছিল সম্ভবত আকালজু। একবার তিনি কাদিয়ানে আসেন, সেই সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক সকালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলেন। চৌরাস্তায় সেই কাশ্মীরিও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হযরত সাহেবকে [তথা মসীহ মাওউদ (আ.)] দেখামাত্র ভালোবাসার আতিশয্যে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে দিলেন। তিনি (আ.) ঝুঁকে তাকে উঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এটি অবৈধ, মানুষকে সিজদা করা উচিত নয়।' (যিকরে হাবীব, পৃ: ১৬২)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির সামনে কখনো সিজদা করা উচিত নয় এবং কারও পায়ের কাছে নত হওয়াও উচিত নয়।

অনুরূপভাবে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) লিখেছেন– একদা এক ব্যক্তি যে জাগতিক পীর-ফকীরের ভক্ত ছিল, তথা তাদের আশেক ছিল, তাদের প্রতি মুগ্ধ ছিল। পীর-ফকীরদের আসরে বসায় অভ্যস্ত ছিল। [মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.)] বলেন, একদা সে আমাদের মসজিদে আসে, লোকদেরকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। সে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)কে বলল, 'আপনাদের মসজিদে তো কোনো আদব-শৃঙ্খলা নেই! সেই ব্যক্তি যে পীর-ফকীরদের আসর থেকে উঠে এসেছিল, সে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে বলল, 'আপনাদের মসজিদে তো কোনো আদব-শৃঙ্খলা নেই! লোকেরা খোলামেলা এবং নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় আপনার সামনে বসে আছে এবং আপনার সঙ্গে অবাধে কথা বলছে, আপনার যথাযথ সম্মান করছে না!'

এর উত্তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন– 'আমি রূক্ষ স্বভাবের নই এবং ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে বসে থাকব যাতে লোকেরা আমাকে বন্য জন্তুর মতো ভয় করে–এটিও আমার রীতি নয়। আমি মূর্তি সাজাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি। আমি তো মূর্তিপূজা দূর করতে এসেছি, নিজে মূর্তি হয়ে বসতে নয় যাতে মানুষ আমার পূজা করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'লা ভালো জানেন, আমি নিজের সত্তাকে অন্য কারও ওপর সামান্যও প্রাধান্য দিই না। আমার দৃষ্টিতে অহংকারী ব্যক্তির চেয়ে বড় মূর্তিপূজারী ও নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। অহংকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নয়; বরং নিজেরই উপাসনা করে।"

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি, পৃ: ৩১৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেবের (রা.)-এর একটি রেওয়াত, তিনি (রা.) বলেন, একদা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিল্লী থেকে ফেরত আসার সময় অমৃতসর যাত্রাবিরতি দেন। হযরত উম্মুল মুমিনীনও সহযাত্রী ছিলেন। হুযূর (আ.) একজন পুত্রকে যিনি সম্ভবত মিঞাঁ বশীর আহমদ সাহেব ছিলেন, কোলে নিলেন এবং একটি ভারি ব্যাগ অপর বগলে নিলেন। অর্থাৎ, একহাতে বাচ্চা উঠিয়েছেন আর অপর হাতে ব্যাগ। আমাকে বললেন, আপনি পানদান (পান রাখার পাত্র) নিয়ে নিন। তিনি (তথা হযরত মুন্সি জাফর আহমদ) সাথে ছিলেন তাকে বললেন, ছোট পানদান রয়েছে সেটি আপনি বহন করুন। আমি বললাম, আমাকে ব্যাগটি দিয়ে দিন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। আমার এক'দুবার বলার পর হুযূর (আ.) একই উত্তর দিলেন। অগত্যা আমি পানদান তুলে নিলাম আর আমরা চলতে শুরু করলাম। এরই মাঝে দু'তিনজন যুবক বয়সের ইংরেজ, যারা স্টেশনে ছিল, আমাকে বললো– হুযূরকে দাঁড়াতে বলুন। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর এরা চাচ্ছেন হুযূর যেন থেমে যান। হুযূর দাঁড়িয়ে গেলেন, সেই ইংরেজারা স্টেশনেই ছিল। তারা এই অবস্থাতেই হুযূরের ছবি তুলে নিলেন– একহাতে বাচ্চা ধরে রেখেছেন আর অপরহাতে মালপত্র বহন করছিলেন। তারা ছবি তুলতে চাচ্ছিল। তাঁর এতটা সরলতা সত্ত্বেও তারা তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হলো এবং তারা বললো– আমরা এই বুযুর্গের ছবি তুলতে চাই।(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮-৫৯)

হযরত মালেক মওলা বখশ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, অমৃতসরে মিঞাঁ জান মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি আমার ঘরের সামনে থাকতেন। তিনি বাচাল ছিলেন। হযরত আকদাস (আ.)-এর পুস্তক 'সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া'-এর কার্যত্ই হাফেয ছিলেন। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আর্যদের সাথে অনেক বিতর্ক করতেন। তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। বিষন্নতা (ডিপ্রেসন) ও উন্মাদনার অবস্থা হয়ে যেত। যার সাথেই সাক্ষাত হতো, তাকেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে নিজের অসুস্থতার বিবরণ সবিস্তারে শোনাতেন। লোকেরা তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যেত। (একসময়) লোকেরা তার কথা শোনা এড়িয়ে যেতে লাগলো। একজন তাকে পরামর্শ দিল– তুমি কাদিয়ান গিয়ে হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দিন সাহেবের কাছে চিকিৎসা করাও। তিনি বললেন, তিনি তো অনেক বড়ো ব্যক্তিত্ব, আমার ঘটনা শোনার তার সময় কোথায়? তিনি বলেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) আমার বিস্তারিত ঘটনা আদৌ শুনবেন না? সে ব্যক্তি বললো, এমনটি নয়, তিনি খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি, অবশ্যই তোমার কথা শুনবেন। অতএব তিনি কাদিয়ান চলে আসলেন। কাকতালীয়ভাবে যখন তিনি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন ঠিক সে সময় হযরত আকদাস (আ.) সাহাবীদের সাথে ভ্রমণ থেকে ফেরত আসছিলেন। ঘোড়ার গাড়ির চালক বললো, এই যে হযরত মির্যা সাহেব আসছেন। আর কী প্রয়োজন! সেই ব্যক্তি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সোজা গিয়ে করমর্দন করলেন এবং নিজের অসুস্থতার বিস্তারিত শোনানো শুরু করলেন। অস্থির হয়ে যেভাবে বর্ণনা করতেন। দীর্ঘ কাহিনী শোনানো শুরু করলেন। ঘটনাগুলো এত দীর্ঘ হলো যে, সবাই বিরক্ত হয়ে গেল, কিন্তু হযরত আকদাস (আ.) নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাত রেখে সব শুনতে লাগলেন। পরিশেষে মিঞাঁ জান মুহাম্মদ সাহেব নিজেই বললেন, অসুস্থ ব্যক্তি যিনি- এখন আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, আমি আর কথা বলতে পারছি না। আমি এতক্ষণ বলেছি আর আপনি শুনেই যাচ্ছেন। এতে হুযূর (আ.) বললেন, ভালো কথা, আপনি অতিথিশালায় যান, কিছু পানাহার করুন, অতঃপর মৌলভী সাহেব অর্থাৎ, হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দিন সাহেবের (রা.)-এর কাছে নিজের অবস্থা শুনিয়ে তাঁর থেকে ঔষধ নিয়ে নিন। তিনি চাঙ্গা হয়ে মৌলভী সাহেবের সমীপে উপস্থিত হলেন, হযরত হেকীম নূরুদ্দিন সাহেবের খেদমতে; আর সেই বিস্তারিত ঘটনাবলি শোনানো শুরু করলেন। হযরত মৌলভী সাহেব দ্রুত ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন, সামান্যই বর্ণনা করেছিলেন এতেই তিনি যেহেতু হেকীম ছিলেন, তাই রোগটা বুঝতে পারলেন। ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন আর বললেন, আমি আপনার রোগ বুঝতে পেরেছি, বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তিনি ব্যবস্থাপত্র তো নিয়ে নিলেন কিন্তু বলতে লাগলেন, বলা হয় মৌলভী নূরুদ্দিন সাহেবের চরিত্র অনেক উন্নত কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের ব্যবহারের সাথে তার কী তুলনা! তিনি পূর্বে বয়আত করেন নি কিন্তু তার হৃদয়ে এই বিষয়টি এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে তিনি বয়আত করে নেন।

তিনি বলেন, এই ঘটনা তার উপস্থিতিতে আমাকে ডাক্তার ইবাদুল্লাহ সাহেব মরহুম শুনিয়েছেন আর তিনি (জান মুহাম্মদ) এর সত্যায়ন করেছেন।"

(আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৩-১৪৪)

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, মাস্টার আল্লাহ দিত্তা সাহেব লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন যে, একবার লাহোরে আহমদীয়া বিল্ডিং-এ হুযূর (আ.) অবস্থান করছিলেন, শারকপুর ভিনি থেকে মুস্তাকিম নামের একজন দুর্বল, ভগ্ন স্বাস্থ্যের এক ব্যক্তি হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। মানুষের ভিড়ে হুযূর (আ.)-এর কাছে পৌঁছাতে না পেরে উঁচু স্বরে বললেন, হুযূর! আমি তো সাক্ষাতের জন্য এসেছি। হুযূর (আ.) বললেন, বাবাজি-কে সামনে আসতে দাও। বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন দাড়াতে কষ্ট হচ্ছিল , এ কারণে হুযূর (আ.) বললেন, বাবাজি-কে কষ্ট দিও না। তারপর হুযূর (আ.) স্বয়ং উঠে তার কাছে গিয়ে বসেন।"(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৬৭২)

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কয়েকজন সাহাবীসহ বাবা সাহেবের চোলা দেখার জন্য ডেরা বাবা নানকে গেলেন, তখন সেখানে একটি বট গাছের নিচে কিছু কাপড় বিছিয়ে জামাতের সদস্যদের সাথে হুযূর (আ.) বসে পড়লেন। মৌলভী মোহাম্মদ আহসান সাহেবও (রা.) সাথে ছিলেন।গ্রামের মানুষ হুযূর (আ.)-এর আগমনের সংবাদ শুনে সেখানে একত্রিত হওয়া শুরু করলো। তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ যারা প্রথমে এসেছিল মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবকে মসীহ মাওউদ (আ.) মনে করে তার সাথে করমর্দন করে বসে যেতে থাকে। তিন চার জন মানুষ করমর্দন করার পর তারা বুঝতে পারল যে তারা ভুল করেছে। এরপর মৌলভীমুহাম্মদ আহসান সাহেব (রা.) প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যারা তার সাথে করমর্দন করতো তিনি হুযূর (আ.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিতেন ইনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)।(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৩০৭)

হযরত শেখ আব্দুল কাদের সাহেব লিখেন, তাঁর (আ.)-এর বড়ো ছেলে হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব মরহুম বলতেন, আমার পিতা যদিও সম্ভ্রান্ত জমিদার

বংশের সন্তান ছিলেন, মোঘল ছিলেন কিন্তু নিজের জীবন একজন মোঘলের মত অতিবাহিত করেননি, বরং ফকিরের মত জীবন অতিবাহিত করেছেন।

কাদিয়ানের কানাইয়্যা লাল সাররাফ-এর বর্ণনা, একবার হযরত মির্যা সাহেবকে বাটালা যেতে হয়। তিনি (আ.) আমাকে বলেন, ঘোড়ার গাড়ি ডেকে দাও। হযরত সাহেব যখন নদীর তীরে পৌঁছলেন তখন তাঁর স্মরণ হলো কোন কিছু ঘরে ফেলে এসেছেন। ঘোড়ার গাড়ি চালককে সেখানেই রেখে তিনি স্বয়ং হেঁটে ফেরত চলেন আসেন। ঘোড়ার গাড়ি চালক পুলে অন্য যাত্রী পেয়ে গেলে সে বাটালা চলে যায় আর মির্যা সাহেব সম্ভবত হেঁটেই বাটালা চলে যান। আমি ঘোড়ার গাড়ির চালককে ডেকে এনে মারধর করি আর বলি, হতভাগা! যদি মির্যা নিজাম উদ্দীন হতো আর তোকে তিনদিন সেখানে বসে থাকতে হতো তবে বসে থাকতি, কিন্তু যেহেতু ইনি নেক ও দরবেশ স্বভাবের মানুষ, এই জন্য তুই তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছিস। তিনি বলেন, যাহোক যখন মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি আমাকে ডেকে এনে বললেন, সে আমার জন্য কেন বসে থাকতো। সে যাত্রি পেয়েছে আর সে চলে গেছে। তুমি কেন তাকে মারধর করেছ? (হায়াতে তৈয়্যবা, পৃ: ১৫-১৬)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাজ্জুদে উঠার চেষ্টা করা উচিত, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও কুনুত পড়া বা দীর্ঘ দোয়া করা। আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে এমন প্রতিটি বিষয় থেকে তওবা করা উচিত। তওবা করার অর্থ হচ্ছে সেই সমস্ত খারাপ কাজ এবং আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার কারণ হয় এমন বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করে সত্যিকার অর্থে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা ও সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। চারিত্রিক সংশোধন করা। এর ফলেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ হয়। মানবীয় অভ্যাসগুলোর সংশোধন ও সুন্দর করা উচিত। ক্রোধ যেন না থাকে বিনয় ও বিনম্রতা এর স্থান নেয়। চরিত্রের সংশোধনের পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা-খয়রাত করা উচিত।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

তিনি (আ.) জামাতকে বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন- "মুত্তাকীদের জন্য এই শর্ত, তারা যেন দীনহীনের ন্যায় বিনয় ও অনাড়ম্বরতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে। এটি তাকওয়ার একটি শাখা। যার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্যায় ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে। উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্দিকগণের জন্য চূড়ান্ত ও কঠিনতম স্তর হলো ক্রোধ এড়িয়ে চলা।

আত্মঅহমিকা ও গর্ব ক্রোধ থেকে জন্মায় আর একইভাবে ক্রোধ নিজেও আত্মঅহমিকা ও গর্বের ফল হয়ে থাকে, কারণ ক্রোধ সেই সময়েই হৃদয়ে দানা বাধে যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়।

আমি চাই না আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পর একে অপরকে ছোট বা বড়ো মনে করবে, অথবা একে অন্যের ওপর গর্ব করবে বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। খোদা জানেন কে বড়ো আর কে ছোট। এটি এক ধরণের অবজ্ঞা এবং যার মাঝে অবজ্ঞা রয়েছে, ভয় হলো, এই অবজ্ঞা বীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে তার ধ্বংস ডেকে আনবে। কতিপয় ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা করে অত্যন্ত সম্মানসূচক আচরণ করে, কিন্তু সম্মানিত সে যে দরিদ্রের কথা বিনয়ের সাথে শোনে। তার মনস্তুষ্টি করে। তার কথার সম্মান করে, মুখে এমন কোন অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ না করে যা তাকে কষ্ট দেয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অনুবাদ: নাম বিকৃত করে তোমরা একে অন্যকে ডেকো না। ঈমান আনার পর এমন অবাধ্যতা করা অনেক বড় পাপ। এটি হতে যারা তৌবা করে না তারাই সীমালঙ্ঘনকারী [সূরা হুজুরাত:১২]।

এর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন- পরস্পরকে ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে জন্য বিকৃত নামে ডেকো না, বিকৃত নাম রেখো না। এ কাজটি দুষ্কৃতকারী ও পাপাচারীর কাজ। যে ব্যক্তি কারো উপহাসমূলক নাম রাখে সে নিজে অনুরূপ কষ্টের মুখোমুখী না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। নিজের ভাইদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। সবাই যেহেতু একই প্রস্রবণ থেকে পানি পান কর, তাহলে কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি পান করা নির্ধারিত আছে। পার্থিব নীতিমালায় কেউ সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হতে পারে না। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহান সে যে মুত্তাকি।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ অনুবাদ: তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে অবহিত। [সূরা হুজুরাত:১৪] (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০-৩১)

মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রকৃত অর্থে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের সামর্থ্য দান করুন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের পর আমরা যেন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করতে পারি ও প্রকৃত অর্থে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, (আমীন)।

১১ খুতবার শেষাংশ.

যদিও আমি আপনার কাছে এই বিষয়গুলোর অভিযোগ করছি, তবুও আপনার অন্তরের পরিচ্ছনড়বতার কারণে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। আমাকে যদি মানুষ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে আমি বুঝব- আমার ভাগ্যে এমনটিই লেখা ছিল। জয়-পরাজয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বন্দেগি ও আনুগত্যই আমার মূল উদ্দেশ্য। আনুগত্য করাই আমার কাজ; আমি জয়ী হলাম নাকি হলাম না- তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাকে তো আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেছেন- 'এটি করো', আর তাঁরই আনুগত্যে আমি এটি করছি এবং এই দাবি করেছি। আমি জানি, এই বিরোধিতার পেছনে আপনার নিয়্যত ভালোই হবে; কিন্তু আমার মতে এটি উত্তম হবে যে, আপনি প্রথমে আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং আমার পুস্তকসমূহ- অর্থাৎ ফতেহ ইসলাম, তওযীহে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম এই পুস্তক তিনটি পড়ে নিয়ে তারপর কিছু লিখুন। আপনার মতো বন্ধুর বিরোধিতায় আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ মতের এই বিরোধিতাও হয়ত সত্যের জন্যই হবে। হয়ত আপনি সত্যের খাতিরেই লড়াই করছেন; কিন্তু প্রথমে আপনি আমার বইগুলো তো পড়ে নিন। এখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার মতো স্বাস্থ্য আমার রয়েছে, আমি আসতে পারব। আমার স্বাস্থ্য এখন ঠিক আছে এবং আমি সাক্ষাতের জন্য আসতে পারি। আপনি যদি বাটালায় চলে আসেন- সেক্ষেত্রে যদিও আমি অসুস্থ এবং আমার মাথা ঘোরার সমস্যা এতটাই তীব্র যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়া যায় না- তবুও আমি কোনোমতে কষ্ট করে হলেও আপনার কাছে পৌঁছে যাব। অন্তত ভ্রমণ করার মতো স্বাস্থ্য আমার রয়েছে; তবে আমার মাথাব্যথা ও মাথাঘোরার অসুস্থতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি পৌঁছে যাব।"

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের নামে অন্য এক পত্রে লেখেন, "আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে এ অধমের জানামতে আমার ভাই মৌলভী হেকিম নূরুদ্দীন সাহেবের বিপরীতে আপনার লেখায় কিছুটা কঠোরতা ছিল। হেকিম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার জবাবে আপনি অত্যন্ত কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বিনয় ও নম্রতাকে সর্বদা পছন্দ করেন, আর নিজ ভাইদের সাথে আলেমদের আখলাক বা ব্যবহার সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া উচিত। ব্যবহার-চরিত্র উনড়বত হওয়া উচিত। যে ধর্মের সমর্থন ও সহানুভূতির জন্য দিন-রাত চেষ্টা করা হচ্ছে, তা আসলে কী? তা হলো- আমাদের সমস্ত চালচলন, ওঠাবসা এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অভিপ্রায়ের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমার মতে, চরিত্রের সমস্ত শাখার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা বিনয়, নম্রতা ও অধীনতা এবং অহংকারবিরোধী এমন প্রতিটি আত্মনিবেদনকে যেভাবে পছন্দ করেন, চরিত্রের আর কোনো শাখাকে তিনি সেভাবে পছন্দ করেন না। আমার মনে আছে, একবার এক চরম অধার্মিক হিন্দুর সাথে এ অধমের আলোচনা হয়েছিল এবং সে সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের অবমাননা করে চরম হীন শব্দ ব্যবহার করেছিল। ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের কারণে এ অধম কিছুটা 'ওয়াগ্লুয্ আলাইহিম' অর্থাৎ 'তাদের প্রতি কঠোর হও'- এ বিষয়ের ওপর আমল করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে সেই কঠোরতা করা হয়েছিল, তাই আমার ওপর ইলহাম হয়- 'তোমার বক্তব্যের মাঝে কঠোরতা রয়েছে। কোমলতা চাই, কোমলতা!' আমি যদিও তাকে কেবল প্রত্যুত্তরই দিয়েছিলাম, তবুও সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেন, তুমি নম্র ব্যবহার করো। আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে দেখি, তবে আমরা কী আর আমাদের জ্ঞানই বা কী! একটি চড়ুই যদি সমুদ্রে চঞ্চু বা ঠোঁট ডোবায়, তবে তা থেকে কতটুকুই বা কমবে? সমুদ্রের পানি থেকে একটি চড়ুই যদি পানি পান করে বা ঠোঁট ছোঁয়ায়, তবে তাতে সমুদ্রের কী কমতি হবে? আমাদের জন্য এটাই শ্রেয়, আমরা বাস্তবে যেমন একেবারেই নগণ্য, তেমনই যেন ধূলিসম হয়ে থাকি। আমাদের প্রতিপালক-প্রভু যেহেতু আমাদের জন্য অহংকার ও গর্ব করা পছন্দ করেন না, তবে আমরা কেন তা করব? এমন সম্মান- যার ফলে আমরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে যাব- তার চেয়ে আমাদের জন্য অসম্মানই শ্রেয়।" আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার চেয়ে আমাদের জন্য অপমানিত হতে থাকা ঢের ভালো।

সুতরাং তাঁর (আ.) প্রতিটি কথা ও কাজ বিনয় প্রকাশের পরাকাষ্ঠা ছিল। কেবল একটিই অন্বেষণ ছিল- তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যেন লাভ করা যায়, তাঁর বাণী পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তিনি (আ.) আমাদেরও বার বার এ নসীহতই করেছেন যে, বিনয় অবলম্বন করো, এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত; আর এটিই তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পাইয়ে দেবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনয়ের পথসমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বিবেকের স্বাধীনতার আলোকে

মহম্মদ ইনাম গৌরি, নাজিরে আলা, কাদিয়ান

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ: ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। (আলবাকারা:২৫৭)

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ : অর্থাৎ- এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত); সুতারাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।'

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা বল,'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল ও ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরদের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা কিছু মূসা এবং ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা কিছু অন্য সকল নবীগণকে তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপরও (ঈমান রাখি)। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।

(আল বাকারা: ১৩৮)

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে মৌলিক সত্য ও নির্দেশাবলী প্রদান করেছে। যদি এগুলো সামনে রাখা হয় এবং বাস্তবে অনুসরণ করা হয়, তবে ধর্মের নামে প্রতিদিন যে সংঘাত, বিবাদ, হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটে চলেছে, তা নির্মূল করা সম্ভব-তবে শর্ত হলো, এই শান্তিদায়ক ও শান্তিপ্রিয় শিক্ষাগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও মুক্ত রাখতে হবে।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি মাত্র তিনটি আয়াত ও তার অনুবাদ উপস্থাপন করেছি। এখানে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে রাখা এবং স্মরণ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো জাতি বা কোনো দেশের নাম নয়। বরং ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সংশোধন করা এবং তারপর তাকে তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সত্য ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের পথ দেখানো। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে তাঁর পথপ্রদর্শক, নেতা ও নবীদের প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ "প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসূল রয়েছে।" (সূরা ইউনুস: ৪৮) অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন রসূল রয়েছে। একইভাবে বলা হয়েছে: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা আর-রাদ: ৮)

এই কারণেই মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেমন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) -এর প্রতি অবতীর্ণ ওহি-পবিত্র কুরআনের ওপর ঈমান রাখে, তেমনি ঈমানের পূর্ণতার জন্য নীতিগতভাবে তাদের অবশ্যই সেই সব নবীর প্রতিও ঈমান রাখতে হবে, যাঁরা মহানবী (সা.)-এর পূর্বে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ওহি ও ঐশী বাণী লাভ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ যুগের ওহি, ঐশী বাণী এবং বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ জাতির সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মুসলমানদের উচিত তাঁদের সকলের প্রতি এবং তাঁদের আনীত বিধানের প্রতিও ঈমান রাখা এবং ঘোষণা করা: "আমরা তাঁর কোনো রসূলের মধ্যে পার্থক্য করি না।" অর্থাৎ আমরা মুসলমানরা আল্লাহর কোনো রসূলের মধ্যে বৈষম্য করি না। নবুওয়তের মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা সকলেই সমান, যদিও তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মপরিসরের দিক থেকে অবশ্যই তাঁদের মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষার আলোকে, সময়ের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে পবিত্র নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ও তাঁর উত্তম আদর্শের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

আসুন, পরিবার থেকেই শুরু করি। সাধারণত দেখা যায়, কোনো ছেলে যদি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে, তবে তার বাবা-মা তাকে বর্জন করেন। আত্মীয়স্বজন সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। এমন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমানকে কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

এক ব্যক্তি একবার নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমার কিছু আত্মীয় রয়েছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তাঁরা সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে অসদাচরণ করেন। আমি তাঁদের প্রতি নম্রতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করি, কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে সীমালঙ্ঘন ও অজ্ঞতার আচরণ করেন।" মহানবী (সা.) বললেন, "যদি বাস্তবেই বিষয়টি তোমার বর্ণনার মতো হয়, তবে যেন তুমি তাঁদের মুখে ধুলো নিক্ষেপ করছ। অর্থাৎ তোমার উত্তম আচরণ তাঁদের এমনভাবে লজ্জিত করবে যে, তাঁরা মুখ দেখাতে পারবে না। আর যতদিন তুমি এই উত্তম আচরণের ওপর অটল থাকবে, ততদিন আল্লাহ তোমার সাহায্যের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রাখবেন।" (মুসনাদ আহমদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০, মিশরীয় সংস্করণ)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন: আমার মুশরিক মা মদিনায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি তো মুশরিক, তবুও কি আমি তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব? তিনি (সা.) উত্তরে বললেন, "অবশ্যই। তিনি তো তোমার মা। তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।" (বুখারি, কিতাবুল আদব, বাব সিলাতুল ওয়ালিদিল মুশরিক)

মহানবী (সা.)-এর অধিকাংশ রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁর নবুওয়তের দাবির বিরোধিতায় অত্যন্ত নির্যাতনমূলক আচরণ করেছিলেন। তবুও তিনি (সা.) বলতেন যে, কুরাইশের একটি শাখা তাঁর শত্রু হয়ে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে তো রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি এই আত্মীয়তার কর্তব্য পালন করতে থাকবেন।

সুমামাহ ইবনে উসাল নামে একজন সাহাবি ছিলেন, যিনি ইয়ামামায় বসবাস করতেন। মক্কার লোকদের কাছে গম তাঁর অঞ্চল থেকেই যেত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন জানতে পারলেন যে, মক্কার লোকেরা মহানবী (সা.) -এর প্রতি অত্যাচার করছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সেদিন থেকে ইয়ামামা থেকে মক্কায় একটি গমের দানাও যাবে না। তিনি মক্কার লোকদের জানিয়ে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রিয় নবী (সা.) অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইয়ামামা থেকে এক দানাও গম যাবে না। তখন মক্কার লোকেরা মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন জানাল, "আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেন। আমাদের গম বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা অনাহারে মারা যাচ্ছি। আমাদের প্রতি দয়া করুন।" তখন সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ এই মহানবী (সা.)-এর দয়ার কারণে মক্কার মানুষের জন্য আবার গমের সরবরাহ চালু করা হলো।

(ইবনে হিশামের আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ)

একইভাবে, মদিনায় হিজরতের পর মক্কার মানুষ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা হাড় ও মৃত পশুর মাংস পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করলেন, "হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেন, অথচ আপনার নিজ জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য দোয়া করুন, যাতে বৃষ্টি হয় এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়।"

এরা সেই একই মক্কাবাসী ছিল, যারা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে পরপর তিন বছর শি'বে আবু তালিবে (আবু তালিব ঘাঁটিতে) অবরুদ্ধ করে রেখেছিল এবং তাঁদের কাছে খাদ্য ও পানীয় পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সঙ্গে সঙ্গে দোয়ার জন্য হাত তুলে দিলেন। সেই দোয়া এমনভাবে কবুল হলো যে, প্রবল বৃষ্টি হলো এবং মক্কার মানুষের জন্য আবার সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিন ফিরে এলো। (বুখারি, কিতাবুত তাফসির, সূরা আর-রূম / আদ-দুখান)

নিজের আত্মীয়দের প্রসঙ্গ থেকে প্রতিবেশীদের প্রসঙ্গ এলে দেখা যায়, মহানবী (সা.)মুসলিম -অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিবেশীদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও উত্তম আচরণের ওপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, যদি এই শিক্ষার ওপর আমল করা হয়, তবে কেবল ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে পারস্পরিক বিরোধ বা সংঘাতের কোনো সুযোগই থাকবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়।" (তিনি এই কথা তিনবার বলেছিলেন)। জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি মুমিন নয়?" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, "সেই ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট ও আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়।"(বুখারি)

আকস্মিক কষ্ট বা আক্রমণ বিভিন্নভাবে হতে পারে। কখনও মানুষ রাতে উচ্চ শব্দে রেডিও বা টেলিভিশন চালায়, যার ফলে প্রতিবেশী শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। কখনও আবার গৃহস্থালির আবর্জনা প্রতিবেশীর দরজার সামনে ফেলে রাখা হয় ইত্যাদি।

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে আবু যার! যখনই তুমি কোনো ভালো তরকারি রান্না করবে, তখন তার ঝোল একটু বেশি করে রান্না করবে এবং তোমার প্রতিবেশীর কথাও মনে রাখবে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে তোমার প্রতিবেশীদের কাছেও কিছু তরকারি পাঠাবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিবেদন করলেন, "আমি কীভাবে বুঝব যে আমি ভালো কাজ করছি, না মন্দ কাজ করছি?"

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের মুখে শুনবে যে, তুমি খুবই ভালো মানুষ, তখন বুঝবে তোমার চরিত্র ভালো। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদের মুখে শুনবে যে, তুমি খুবই খারাপ, তখন বুঝবে তোমার আচরণ খারাপ।"(ইবনে মাজাহ)

এছাড়াও, নিজের ধর্ম বা মতবাদ প্রচারের জন্য বলপ্রয়োগ করা বা যুদ্ধ করা কখনোই বৈধ নয়। আমি শুরুতেই পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা উপস্থাপন করেছি: "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (লা ইকরাহা ফিদ্দীন)। অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বল প্রয়োগের অনুমতি নেই। আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই এসেছে। এরপর জবরদস্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সত্য এমন এক বিষয়, যা নিজস্ব সত্যতা ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে আশ্বস্ত করে; এর সঙ্গে বলপ্রয়োগ বা সহিংসতার কোনো সম্পর্ক নেই। এখন মানুষের ইচ্ছা, সে ঈমান গ্রহণ করবে অথবা তা প্রত্যাখ্যান করবে।

আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে: "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।" (সূরা আল-কাফিরুন: ৭) অর্থাৎ হে অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীরা! তোমাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা তোমাদের রয়েছে এবং আমার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আমার রয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলো ধর্মীয় স্বাধীনতার চারটি মৌলিক অধিকার প্রদান করে-

১. কাউকে জোরপূর্বক কোনো ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না।

২. কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোনো ধর্মে প্রবেশ করে, তবে তাকে জোর করে বাধা দেওয়া যাবে না।

৩. কেউ তার বিশ্বাস অনুযায়ী অবিচল থাকার, তা প্রকাশ করার এবং তার ধর্মীয় আচার-উপাসনা পালনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা বা জবরদস্তির শিকার হতে পারে না।

৪. কেউ যদি কোনো ধর্মে থাকতে না চায়, তবে তাকে জোর করে সেখানে রাখা বৈধ নয়। আবার কেউ যদি কোনো ধর্মে থাকতে চায়, তবে তাকে জোর করে সেখান থেকে বের করে দেওয়াও বৈধ নয়।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়-এসব যুদ্ধ নাকি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পরিচালিত হয়েছিল-তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইসলামের যুদ্ধগুলো ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক অথবা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিগত আদর্শ এমন ছিল যে, যদিও আল্লাহ তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক ও রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং মর্যাদার দিক থেকে তাঁকে খাতামুন নবিয়্যীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তবুও তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না বা সহ্য করতেন না যে, কোনো মুসলমান অযথা তাঁকে অন্য নবীদের ওপর শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করুক।

যেমন সহিহ বুখারির একটি বর্ণনায় আছে যে, একবার একজন ইহুদি বাজারে পণ্য বিক্রি করছিল। একজন মুসলমান একটি জিনিসের খুব কম দাম প্রস্তাব করলে ইহুদি অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "সেই সত্তার কসম, যিনি মূসাকে সমগ্র মানবজাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" এ কথা শুনে মুসলমানটি রাগান্বিত হয়ে তাকে একটি চড় মারল। ইহুদি পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে অভিযোগ করল, "আমরা আপনার আশ্রয় ও দায়িত্বের অধীনে আছি। এই মুসলমান আমাকে চড় মেরে অন্যায় করেছে।" মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মুসলমানের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমরা আমাকে অন্য নবীদের ওপর শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করো না।"

পরধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যে, ধর্মীয় মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক মিলের বিষয়গুলো খুঁজে বের করা এবং বিদ্বেষ দূর করার চেষ্টা করা। সে অনুযায়ী মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

"বল, হে কিতাবধারীগণ! এমন একটি কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করব না এবং আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতিরেকে কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলমান।"(সূরা আলে ইমরান: ৬৫)

অর্থাৎ তাঁদের একটি অভিন্ন ও সর্বসম্মত নীতির দিকে আহ্বান করো। কিন্তু কেউ যদি এই নীতিও গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তবে তার সঙ্গে বিবাদ বা যুদ্ধ করার কোনো অনুমতি নেই। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের জানিয়ে দেওয়া হবে-এটাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটাই আমাদের বিশ্বাস।

মক্কার অবিশ্বাসীদের নিরন্তর বিরোধিতা ও নির্মম নির্যাতনের কারণে এবং সর্বোপরি মুসলমানদের তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চলা ও তা প্রচার করা থেকে জোরপূর্বক বাধা দেওয়ার ফলে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে কিছু নবমুসলিম পরিবার ছাড়াও তিনটি ইহুদি গোত্র-বানু কাইনুকা, বানু নাজির ও বানু কুরাইযা-এবং দুটি মুশরিক গোত্র-আওস ও খাযরাজ-বসবাস করত।

এই পাঁচটি গোত্রের মধ্যে কোনো সুশৃঙ্খল আইন-শৃঙ্খলা ছিল না। বিশেষ করে তিনটি ইহুদি গোত্র পৃথক পৃথক দুর্গে স্বাধীনভাবে বসবাস করত। এই পরিস্থিতিতে, মদিনা রাষ্ট্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এর কয়েকটি শর্ত ছিল নিম্নরূপ-

১. মুসলমান ও ইহুদিরা পারস্পরিক সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে বসবাস করবে এবং একে অপরের ওপর কোনো ধরনের অত্যাচার বা অবিচার করবে না।

২. প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

৩. সব ধরনের মতভেদ ও বিরোধের ক্ষেত্রে তারা পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মামলা তাদের নিজস্ব (ধর্মীয়) আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৪. সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

৫. কোনো গোত্র যদি ইহুদিদের বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে ইহুদি ও মুসলমান পরস্পরের সহায়তা ও সমর্থনে একসঙ্গে দাঁড়াবে।

৬. মদিনার ওপর আক্রমণ হলে সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে তার প্রতিরক্ষা করবে।

৭. পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুমতি ছাড়া কোনো পক্ষ যুদ্ধের জন্য বের হবে না।

৮. এই চুক্তি অনুযায়ী কোনো অত্যাচারী বা অশান্তি সৃষ্টিকারীকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে না, ইত্যাদি।

যদিও ইহুদি গোত্রগুলো বারবার এই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তবুও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণ বজায় রেখেছিলেন।

অতএব, এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মদিনা রাষ্ট্রে মহনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা-বিশেষত বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসাবলম্বী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রে প্রত্যেককে তাদের বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী চলার, তা প্রকাশ করার এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করার স্বাধীনতা প্রদান এবং বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা করা-ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

একবার নাজরান থেকে একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল ধর্মীয় আলোচনার জন্য মদিনায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছিল। তিনি তাঁদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মসজিদে নববিতে আতিথ্য দিয়েছিলেন। যখন তাঁরা নিজেদের উপাসনা করার জন্য বাইরে কোনো স্থান খুঁজছিলেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এদিক-ওদিক যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা এই মসজিদেই নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনা করতে পার।"

পবিত্র কুরআন এমনকি এই শিক্ষাও দিয়েছে যে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তা বা বস্তুর উপাসনা করে, তাদের উপাস্যদের গালমন্দ করো না; অন্যথায় তারা অজ্ঞতা ও শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবে। (সূরা আল-আনআম: ১০৯)

উহুদের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকরা মুসলিম শহীদদের মৃতদেহ বিকৃত করেছিল। তারা তাঁদের নাক, কান ইত্যাদি কেটে ফেলেছিল এবং মৃতদেহের অবমাননা করেছিল। তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তাঁদের সঙ্গে একই ধরনের প্রতিশোধমূলক আচরণ করেননি। বরং তাঁর আদর্শ ছিল এমন যে, একবার একটি ইহুদির জানাজার শোভাযাত্রা তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ নিবেদন করল, "হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটি তো একজন ইহুদির জানাজা।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, "তার কি একটি প্রাণ ছিল না? সে কি একজন মানুষ ছিল না?(বুখারি)

হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা (রা.) বর্ণনা করেন: আমি বহু সফরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। কখনো এমন হয়নি যে, তিনি কোনো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন এবং তা দাফনের ব্যবস্থা করেননি। তিনি কখনো জিজ্ঞাসাও করেননি যে, মৃত ব্যক্তি মুসলমান না অবিশ্বাসী।

বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতাদের মৃতদেহ মক্কার মুশরিকরা পালিয়ে যাওয়ার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে গিয়েছিল। পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁদের সবাইকে একটি গর্তে দাফন করান, যা বদরের কূপ নামে পরিচিত। (বুখারি, কিতাবুল মাগাযি)

আহযাব (খন্দক) যুদ্ধে নওফল ইবনে আবদুল্লাহ মাখযুমি নামে এক মুশরিক নেতা যুদ্ধে নিহত হয়। মক্কার মুশরিকরা আশঙ্কা করছিল যে, তাঁদের নেতার সঙ্গেও হয়তো সেই একই নিষ্ঠুর আচরণ করা হবে, যা হযরত হামযা (রা.)-এর মৃতদেহের সঙ্গে করা হয়েছিল। তাই তারা আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দশ হাজার দিরহাম দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে নওফলের মৃতদেহ ফেরত চাইল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, "আমরা মৃতদেহের বিনিময়ে কোনো অর্থ গ্রহণ করি না। তোমরা তোমাদের মৃতদেহ নিয়ে যাও।" (আল-বাইহাকি, দালায়িলুন নবুওয়াহ, খণ্ড ৩)

বিজিত ও পরাজিত জাতির প্রতি সদয় আচরণ করা-বিশেষত যাদের হাতে বছরের পর বছর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে-বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারও জীবনে দেখা যায় না।

মক্কার মুশরিক নেতা আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা সারা জীবন তাঁর পিতার মতোই আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এমনকি মক্কা বিজয়ের সময়ও, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করার পরও, সে একটি মুসলিম দলের ওপর আক্রমণ করে হারাম এলাকায় রক্তপাত ঘটায়। ফলে যুদ্ধাপরাধের কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ঘোষণা করা হয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী উম্মে হাকিম, যিনি ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। উম্মে হাকিম তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে আনেন। সে যখন জাহাজে উঠতে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে ধরে বললেন, "ফিরে চলো। আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" কিন্তু ইকরিমা প্রথমে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। তবুও স্ত্রীর অনুরোধে সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মক্কায় ফিরে এসে পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিবেদন করল, "আপনি কি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করেছেন?"তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।" এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, "আমি তখনও আমার পূর্ব ধর্মেই ছিলাম, তবুও কি আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন?"তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ।" তখন সেই মুশরিক ইকরিমার হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। এই সহিষ্ণুতা ও উত্তম আচরণ দেখে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সত্যিই আত্মীয়দের প্রতি অত্যন্ত সদয়, অসীম সহিষ্ণু এবং সর্বাধিক দানশীল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।"

(আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯২, বৈরুত সংস্করণ)

এমন অপরাধীদের মধ্যেই ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা, যে উহুদের যুদ্ধে পবিত্র নবীর চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর মৃতদেহের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছিল। তিনি তাঁর নাক, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলেছিল, মৃতদেহ বিকৃত করেছিল এবং প্রতিশোধের আগুন নেভানোর জন্য তাঁর কলিজা চিবিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর যখন আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনিও মুখ ঢেকে সেখানে উপস্থিত হন। কারণ তাঁর অপরাধের জন্য তাকেও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- "...যখন নারীরা বাইআতের জন্য এলো, তখন হিন্দাও একটি চাদর গায়ে দিয়ে এলো। সেও বাইআত করল। যখন সে সেই অংশে পৌঁছাল, যেখানে বলা হয়েছিল, 'আমরা শিরক করব না', তখন তার স্বভাব ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি এখনও শিরক করব? আপনি তো একাই ছিলেন, আর আমরা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে আপনার বিরোধিতা করেছি। যদি আমাদের উপাস্যরা সত্য হতো, তবে আপনি কীভাবে বিজয়ী হতেন? তারা সম্পূর্ণ অসহায় প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা পরাজিত হয়েছি।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ কি হিন্দা?' তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেছিলেন; সর্বোপরি সে ছিল আত্মীয়া। হিন্দা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি এখন মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমাকে হত্যা করার অধিকার আপনার নেই।' আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, এখন তোমার বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।' সংক্ষেপে, যে জাতি মনে করেছিল যে, তিনি সব উপাস্যকে ধ্বংস করে এক আল্লাহর শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই জাতির মধ্যে এমন পরিবর্তন এলো যে, হিনদার মতো একজন নারী বলল, 'আল্লাহ যে এক, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?' (আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে আমি শেষাংশে একটি বিষয় নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করছি। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনরায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহান আল্লাহ এই যুগে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে, যিনি পবিত্র নবীর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ও প্রতিফলন, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে ভারতের ভূমিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর একটি বড় কারণ সম্ভবত এই যে, ভারত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আবাসভূমি, বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের মানুষের দেশ। মহান আল্লাহ এই দেশকে ইসলামের সুন্দর ও শান্তিদায়ক শিক্ষার প্রচারের একটি কেন্দ্র বানিয়েছেন এবং এই দেশ থেকেই আজ সেই আলো বিশ্বের ২২০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি, ভারতের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হলো হিন্দু ও মুসলমান। তাঁদের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিতে গিয়ে আহমদিয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর জীবনের শেষদিকে "পয়গামে সুলহ"(শান্তির বার্তা) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সময়ের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় সেখান থেকে কয়েকটি অংশ উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন- "হে শ্রোতাবৃন্দ! আমরা মুসলমান হই বা হিন্দু, শত শত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই সেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখি, যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও অধিপতি। একইভাবে মানবতার পরিচয়ের দিক থেকেও আমরা সবাই এক-অর্থাৎ আমরা সবাই মানুষ নামে পরিচিত। আবার আমরা যেহেতু একই দেশের অধিবাসী, তাই আমরা একে অপরের প্রতিবেশী। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, অন্তরের পবিত্রতা ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা একে অপরের সহচর হই, ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রের সমস্যায় একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করি এবং এমন সহানুভূতি দেখাই যেন আমরা পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছি।

হে স্বদেশবাসীগণ! যে ধর্ম সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা দেয় না, তা প্রকৃত ধর্ম নয়। আর যে মানুষের মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই, সে প্রকৃত মানুষ নয়। আমাদের আল্লাহ কোনো জাতির মধ্যে বৈষম্য করেননি। যেমন আর্যাবর্তের প্রাচীন জাতিগুলোকে যে মানবিক শক্তি ও যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে, তেমনি আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন, জাপান এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোকেও সেই একই শক্তি ও যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য আল্লাহর পৃথিবী একই মেঝে। সবার জন্য তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্র একইভাবে আলো দেয় এবং অন্যান্য সেবাও করে। তাঁর সৃষ্ট বায়ু, পানি, আগুন, মাটি এবং শস্য, ফলমূল, ঔষধসহ সব সৃষ্ট বস্তু থেকে সব জাতিই সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং এই ঐশী নৈতিকতা আমাদেরও শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন আমাদের সহমানুষদের সঙ্গে দয়া ও উত্তম আচরণ করি এবং সংকীর্ণমনা ও সংকীর্ণ হৃদয়ের না হই।"

(পয়গামে সুলহ, রূহানী খাযায়িন, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৪০)

এরপর পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বরকতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন- "এ কথা কারও অজানা নয় যে, ঐক্য এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে এমন সব সমস্যা দূর হয় যা অন্য কোনো উপায়ে দূর করা যায় না এবং এমন সব জটিলতার সমাধান হয় যা অন্য কোনো কৌশলে সম্ভব নয়। তাই কোনো বুদ্ধিমান মানুষের জন্য ঐক্যের বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা শোভন নয়। এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান এমন দুটি সম্প্রদায় যে, কোনো এক সময় হিন্দুরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের এই দেশ থেকে বের করে দেবে, অথবা মুসলমানরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদের নির্বাসিত করবে-এমন ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বরং এখন হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। একজনের ওপর কোনো বিপদ এলে অন্যজনও তাতে অংশীদার হবে... তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের বিনাশ কামনা করে, সে সেই ব্যক্তির মতো, যে গাছের একটি শাখায় বসে সেই শাখাকেই কর্তন করতে উদ্যত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরাও এখন শিক্ষিত হয়েছ। তাই এখন শত্রুতা ত্যাগ করে ভালোবাসার পথে অগ্রসর হওয়াই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং উদাসীনতা পরিত্যাগ করে সহানুভূতি গ্রহণ করাই তোমাদের প্রজ্ঞার পরিচয়...

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ!

বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেক পথের অনুসারী নিজ নিজ বিশ্বাসকে পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করে, সে অনুযায়ী জীবনযাপন করে এবং যুক্তিসংগত ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তির মাধ্যমে অন্যদেরও তা বোঝাতে পারে। এটাই ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রকৃত ধারণা ও অর্থ। পক্ষান্তরে, কেউ যদি অন্যের ধর্মীয় নেতাদের বা তাদের স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থকে অপমান বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, তবে তার ফল হবে কেবল অশান্তি, সংঘাত ও যুদ্ধ। অন্যথায়, সামান্য মতপার্থক্য কখনো পারস্পরিক শান্তি ও ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"হে প্রিয়জন! প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং বারবার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতির নবী ও রসূলদের অপমানের সঙ্গে স্মরণ করা এবং তাঁদের গালমন্দ করা এমন এক বিষ, যা শেষ পর্যন্ত শুধু দেহকেই ধ্বংস করে না, বরং আত্মাকেও ধ্বংস করে এবং ধর্ম ও দুনিয়া-উভয়কেই নষ্ট করে দেয়।

যে দেশের অধিবাসীরা একে অপরের ধর্মীয় পথপ্রদর্শকদের দোষ খুঁজতে এবং তাঁদের অবমাননা করতে ব্যস্ত থাকে, সে দেশে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর যে জাতির মধ্যে একটি বা উভয় সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের নবী, ঋষি বা অবতারদের সর্বদা মন্দ বা অশালীন ভাষায় স্মরণ করে, সেখানে প্রকৃত ঐক্য কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

আর আমরা কখনোই অন্য জাতির নবীদের সম্পর্কে অশালীন ভাষা ব্যবহার করি না। বরং আমাদের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কাছে যতজন নবী এসেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের গ্রহণ করেছে এবং পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর সেই ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ওপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে-এটিই তাঁদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ। কারণ তাঁরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হতেন, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে এই গ্রহণযোগ্যতা কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতো না।"

(শেষাংশ ২৩ পাতায়.......)

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ: মানবজাতির অগ্রগতির জন্য এক চিরন্তন পথ

শেখ মহম্মদ যাকারিয়া, মুবাল্লিগ সিলসিলা, নশর-ও-ইশাআত

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলে মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (আল আহযাব: ২২)

বালাগাল উলা বিকামালিহি/ কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহি
হাসানাত জামিও খিসালিহি/ সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও পথই সমগ্র মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পথপ্রদর্শক নীতি। মহানবী (সা.) প্রতিটি নৈতিক গুণে সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন:

"আমাকে উচ্চতম নৈতিক গুণাবলীকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।"

অর্থাৎ, আমাকে হারিয়ে যাওয়া নৈতিক মূল্যবোধগুলো পুনরুদ্ধার ও সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি এই মিশনকে সর্বোত্তমভাবে পূর্ণ করেছেন।

"নিশ্চয়ই তুমি উচ্চতম মানের নৈতিক উৎকর্ষের অধিকারী।"

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি সুষম ও স্থায়ী কাঠামো যা ব্যক্তির সংস্কার থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ পর্যন্ত প্রতিটি মানবিক প্রয়োজন পূরণ করে। এটি ন্যায়বিচার, সমতা এবং মধ্যপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের একটি আদর্শ ব্যবস্থা উপস্থাপন করে। অন্য কথায়,মহানবী (সা.)-এর আদর্শ মানব উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তৃত, সর্বজনীন এবং টেকসই মডেল যা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মাত্রাগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এই মডেলটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংস্কার থেকে শুরু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি পর্যন্ত।

সম্মানিত বন্ধুগণ! মানব অগ্রগতির সূচনা হয় অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা থেকে। মহানবী (সা.) উন্নত নৈতিকতা, সততা এবং সত্যবাদিতাকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। অন্য কথায়, চরিত্র গঠন এবং নৈতিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। মানব অগ্রগতি সৎ নৈতিকতা ও সৎ চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র উদাহরণটি শিক্ষা দেয় যে, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা, সহনশীলতা এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ ছাড়া কোনো সমাজ স্থিতিশীল থাকতে পারে না। নৈতিক মূল্যবোধের এই স্থায়ী দিকটি প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, যাকাত এবং বাণিজ্যে স্বচ্ছতার উপর জোর দেয়। এটি দরিদ্র ও অভাবীদের অধিকার রক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে। অন্য কথায়, নবীয় উদাহরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থনীতি ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জনকল্যাণের চারপাশে ঘুরে, যেখানে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, বাণিজ্যে স্বচ্ছতা, সুদমুক্ত সমাজ এবং শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা রয়েছে। মদীনার রাষ্ট্রে পবিত্র নবী (দরূদ ও সালাম আলাইহি) যাকাত, স্বেচ্ছা দান এবং ওয়াকফের মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যও একটি উৎকৃষ্ট মডেল হয়ে রয়েছে।

বিদায়ী ভাষণটি মানব সমতার একটি সর্বজনীন সনদ। এটি জাতি, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য ছাড়াই সকল মানুষকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছে। অন্য কথায়, আধুনিক বিশ্ব আজ যে সর্বজনীন মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং সমতার সনদ উপস্থাপন করে, তা শতাব্দী আগেই নবীয় উদাহরণে তার সম্পূর্ণ ও বাস্তব রূপে প্রদর্শিত হয়েছিল। বিদায়ী ভাষণের মাধ্যমে পবিত্র নবী (দরূদ ও সালাম আলাইহি) জাতি, গোষ্ঠী এবং বর্ণের পার্থক্য বিলোপ করে সমগ্র মানবজাতিকে সমতা প্রদান করেছিলেন, যা টেকসই সামাজিক উন্নয়নের মৌলিক শর্ত।

শক্তিশালী পরিবারগুলো সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি। মহানবী (সা.) এর শিক্ষা পরিবারিক সম্পর্ক, পিতামাতার অধিকার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে উৎসাহিত করে।

মহানবী (সা.) পানির অপচয় নিষিদ্ধ করেছিলেন, বৃক্ষরোপণকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা আধুনিক টেকসই উন্নয়নেরও ভিত্তি। সম্পদের অযথা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এবং পানির ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ এবং প্রাণীদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আজকের টেকসই উন্নয়নের মডেলও পরিবেশগত দায়িত্ব এবং সম্পদের সতর্ক ব্যবহারের উপর জোর দেয়, যার স্পষ্ট উদাহরণ মহানবী (সা.)- এর বরকতময় জীবনে পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) পবিত্র নবী (দরূদ ও সালাম আলাইহি) এর প্রতিটি নৈতিক গুণের পরিপূর্ণতা ঘোষণা করতে গিয়ে লিখেছেন:

প্রখর বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ মেধা, দ্রুত অনুধাবনশক্তি, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, উৎকৃষ্ট স্মৃতিশক্তি, সহজে স্মরণ করার ক্ষমতা, পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা (কানাআত), দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ), তাকওয়া ও সন্দেহজনক বিষয় থেকেও বিরত থাকার স্বভাব (তাওয়াররু'), বীরত্ব, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, যথাস্থানে উদারতা, যথাস্থানে দানশীলতা, যথাস্থানে সৌজন্য ও মহানুভবতা, যথাস্থানে সাহসিকতা, যথাস্থানে উচ্চ মনোবল, যথাস্থানে সহনশীলতা, যথাস্থানে ধৈর্যধারণ, যথাস্থানে আত্মমর্যাদাবোধ, যথাস্থানে বিনয়, যথাস্থানে শিষ্টাচার, যথাস্থানে স্নেহ, যথাস্থানে কোমলতা, যথাস্থানে দয়া, আল্লাহভীতি, আল্লাহর প্রতি প্রেম, আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ এবং আল্লাহর প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হওয়া-ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলি সেই নিষ্পাপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে এমন আশ্চর্য ভারসাম্য, সূক্ষ্মতা ও নূরানিয়তের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল যে, ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সেগুলো স্বভাবতই স্বয়ং প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এরপর সেই নূরসমূহের উপর আরও একটি আসমানি নূর-অর্থাৎ আল্লাহর ওহি-অবতীর্ণ হলো। আর সেই ওহির নূর যুক্ত হওয়ার ফলে খাতামুন নবিয়্যীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সত্তা নূরের সমাবেশস্থল (মাজমাউল আনওয়ার)-এ পরিণত হলো।

(বরাহীনে আহমদিয়্যা, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৫, পাদটীকা ১১)

মুহাম্মদে আরবী বাদশাহ হার দো সরা
কর রহে রূহে কুদুস জিসকে দর কি দরবানী
উসে খুদা তো না কেহ সকু পে কেহতা হুঁ
কি উসকি মারতবাদানী মেঁ হ্যায় খুদাদানী
অর্থ: আরবের মুহাম্মদ দুই জগতের বাদশাহ
পবিত্র আত্মা তাঁর দরজায় প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে।
আমি তাঁকে আল্লাহ বলতে পারি না, তবুও বলি
তাঁর মর্যাদা বোঝার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেছেন:

"মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং বরকতময় উদাহরণের বিষয় অফুরন্ত। তাঁর প্রতিটি নৈতিক গুণ একটি মহান মডেল উপস্থাপন করে, এবং কেন করবে না? তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং নৈতিক উৎকর্ষের শিক্ষক। এমনকি যদি কোনো অনৈতিক ব্যক্তি তাঁর সামনে আসত, তিনি তবুও তার প্রতি দয়া এবং শিষ্টাচারমূলক আচরণ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্যে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তাকে দেখে নবী (সা.) বললেন যে, সে তার পরিবারের মধ্যে খুব খারাপ ভাই, অর্থাৎ সে ভাই হিসেবে খারাপ আচরণ করে, এবং তার পরিবারের খুব খারাপ ছেলে। তবে যখন লোকটি ভিতরে এসে বসল, পবিত্র নবী (দরূদ ও সালাম আলাইহি) তাকে অত্যন্ত অনুগ্রহের সাথে গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত শিষ্টাচারের সাথে তার সাথে কথা বললেন, যদিও সে খারাপ ভাই, খারাপ ছেলে এবং অনেক অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।

লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যখন প্রথম তাকে দেখলেন, তখন তার সম্পর্কে এমন এমন বললেন, অথচ তার সাথে কথোপকথনের সময় আপনি অসাধারণ দয়া ও প্রফুল্লতা প্রদর্শন করলেন।'

মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন, 'আয়েশা! তুমি কি কখনো আমাকে গালাগালি করতে দেখেছ? নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি সেই যার দুষ্টতার কারণে মানুষ তার সাথে দেখা করতে এড়িয়ে যায়।'

(সহীহ আল-বুখারী, আদাবের কিতাব, অধ্যায়: নবী অশ্লীল বা অশ্লীল ভাষী ছিলেন না, হাদীস নং ৬০৩২)

(খুতবা জুমআ, ১ ডিসেম্বর ২০১৭)

হাসিনানে আলাম হুয়ে শারমাগীঁ জো দেখা ওহ হুসন অউর ওহ নুরে জাবীঁ
ফির ইসপর ওহ আখলাক আকমাল তরীঁ কি দুশমন ভি কেহনে লাগে আফরীঁ
অর্থ: বিশ্বের সৌন্দর্যগুলো লজ্জায় নত হয়ে গিয়েছিল
যখন তারা সেই সৌন্দর্য এবং সেই উজ্জ্বল মুখ দেখেছিল।
তারপর এসেছিল সেই সর্বোত্তম নৈতিকতা,
যা শত্রুরাও বলেছিল, "অসাধারণ!
কত পরিপূর্ণ চরিত্র! কত সম্পূর্ণ সৌন্দর্য!
তোমার উপর দরূদ; তোমার উপর সালাম।

তিনি আরও বলেছেন:

"তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণগুলোর মধ্যে একটি ছিল বিনয় ও নম্রতা, বরং বলা যায় যে, বিনয় ও নম্রতাতেও তাঁর নৈতিক উৎকর্ষ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। তাঁর বিনয় বর্ণনা করে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, কখনো এমন হয়নি যে কোনো সাহাবী বা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য তাঁকে ডেকেছে এবং তিনি 'লাব্বাইক' (এখানে আমি আছি) বলে উত্তর না দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন:

'নিশ্চয়ই তুমি উচ্চতম মানের নৈতিক উৎকর্ষের অধিকারী।'

(সূরা আল-কালাম: ৫)

তোমাকে সর্বোচ্চ নৈতিক চরিত্র দান করা হয়েছে।"

(তাফসীর আদ-দুররুল মানসূর, খণ্ড ৮, পৃ. ২২৬, সূরা আল-কালামের অধীনে আয়াত "নিশ্চয়ই তুমি উচ্চতম মানের নৈতিক উৎকর্ষের অধিকারী)

(খুতবা জুমআ, ১ ডিসেম্বর ২০১৭)

ভালোবাসা দিয়ে তুমি আহত হৃদয় জয় করেছ;
স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে প্রতিটি মনকে বিশ্বাসী করেছ।
তুমি অজ্ঞতা দূর করেছ;
তুমি শরিয়তকে পূর্ণতা দার্ন করেছ।
তুমি সকল হালাল ও হারাম স্পষ্ট করে দিয়েছ।
তোমার উপর দরূদ; তোমার উপর সালাম।

যখন মুমিনদেরকে মহানবী (সা.)- এর অনুসরণ ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 'وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ-وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ-وَاتَّقُوا اللّٰهَ-اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ'

"আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো; এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিতে কঠোর।" (সূরা আল-হাশর ৫৯:৭)

মহান আল্লাহ আরও বলেন: 'قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ-وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ'

"বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'"(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"'যদি তোমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো। এই অনুসরণের ফল হবে যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।'

তিনি আরও বলেন: "সুতরাং এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসারী হয়ে ওঠে, সে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত লাভ করতে পারে না। তাকে সেই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিও দান করা হয় না যা তার পাপপূর্ণ জীবন ও কামনা-বাসনার আগুনকে শীতল করে। এমন লোকেরাই 'আমার উম্মতের আলেমগণ' শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত।" (মালফুজাত, খণ্ড ৮, পৃ. ৯৬-৯৭, ১৯৮৫ সংস্করণ, যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত)

এ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, সত্যিকারের সফল জীবন এবং যে জীবন অগ্রগতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেয়, তা হলো মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী জীবন। যদি আমাদের জীবনযাপন ও মৃত্যু, ঘুম ও জাগরণ সবকিছু মহানবী (সা.)- এর আদর্শ অনুসারে গঠিত হয়, তবে আমাদের সকল কর্ম ইবাদতে পরিণত হবে। আল্লাহর রসূল (সা.)-এর মডেল-টেকসই অগ্রগতির মডেল-গ্রহণ করে আমরা সত্যিকারের উন্নয়নের পথে স্থিরভাবে অগ্রসর হতে থাকব।

মুসলমানদের মধ্যে রসুল (সা.)- এর এই আনুগত্যের অনুপস্থিতির কারণেই তারা আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) এই অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভেদের কারণও এই দুনিয়ার ভালোবাসা। যদি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি তাদের অগ্রাধিকার হতো, তবে তাদের জন্য সহজ হয়ে যেত যে, কোন দলের নীতিমালা অধিকতর স্পষ্ট তা চিনতে পারা এবং তা গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কিন্তু এখন, যেহেতু এই দুর্নীতি দুনিয়াবী আসক্তির কারণে উদ্ভূত হয়েছে, তাহলে এমন লোকদেরকে সত্যিকারের মুসলমান বলা যায় কীভাবে যাদের পদক্ষেপ মহানবী (সা.)- এর পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? মহান আল্লাহ বলেছেন:

'বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।'

তিনি আরও বলেন: "কিন্তু এখন, আল্লাহর ভালোবাসার পরিবর্তে এবং আল্লাহর রসূল (সা.)- এর অনুসরণের পরিবর্তে দুনিয়ার ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এটাই কি মহানবী (সা.)- এর অনুসরণ? মহানবী (সা.)- কি দুনিয়ামুখী মানুষ ছিলেন? তিনি কি, আল্লাহ না করুন, সুদ নিতেন? তিনি কি আল্লাহর ফরজ ও আদেশসমূহ অবহেলা করতেন? তিনি কি কপটতা বা মিথ্যার সাথে আপস করতেন? তিনি কি ধর্মের উপর দুনিয়াবী স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন? চিন্তা করো! সত্যিকারের অনুসরণ মানে মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, এবং তখন তুমি দেখবে কীভাবে মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ দান করেন।"

(মালফুজাত, খণ্ড ৮, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯, ১৯৮৫ সংস্করণ, যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ (আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিটি ধরনের অগ্রগতি লাভ করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর এই উন্নত মানসমূহ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যে রূপান্তর সাধন করেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন: "আমি অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা করছি যে, যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু হোক না কেন, সে খ্রিস্টানই হোক বা আর্যই হোক, যখন সে মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং তারপর তাঁর শিক্ষা ও প্রভাবের মাধ্যমে সাধিত রূপান্তর বিবেচনা করবে, তখন সে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবে।

এটি একটি সরল সত্য যে, পবিত্র কুরআন তাদের পূর্ববর্তী অবস্থা এই শব্দে চিত্রিত করে।"

(মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করার পূর্বে আরবদের উল্লেখ করে তিনি বলেন:)

"'তারা খায় যেমন পশুরা খায়।' (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৩)

এটাই ছিল কুফরের সময় তাদের অবস্থা; তারা পশুর মতো জীবনযাপন করত। তারপর, যখন মহানবী (সা.)- এর পবিত্র প্রভাব তাদেরকে রূপান্তরিত করল, তাদের অবস্থা হয়ে গেল: يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

'তারা রাত্রিযাপন করে তাদের প্রভুর সামনে, সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে।' (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৬৫)

হযরত মসীহ মওউদ(আলাইহিস সালাম) বলেন:

"যখন কেউ দেখে যে, মহানবী (সা.) আরব বেদুঈনদের মধ্যে কী রূপান্তর সাধন করেছিলেন, এবং দেখে যে, কোন গভীরতা থেকে তিনি তাদের উত্থান করেছিলেন এবং কোন উচ্চতা ও মর্যাদায় তিনি তাদেরকে উন্নীত করেছিলেন, তখন অবলীলায় চোখে পানি চলে আসে, উপলব্ধি করে যে, তিনি কী মহান বিপ্লব সাধন করেছিলেন।"

তিনি আরও বলেন: "বিশ্বের কোনো ইতিহাস এবং কোনো জাতি এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে না। এটি কোনো কল্পকাহিনী নয়; এগুলো ঐতিহাসিক সত্য যার সত্যতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বীকার করেছে।"

(মালফুজাত, খণ্ড ৯, পৃ. ১৪৪-১৪৫, ১৯৮৫ সংস্করণ, যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত)

তুমি লাঞ্ছনায় নিমজ্জিত এক জাতির সামনে এসেছিলে,
তারপর তাদেরকে বিশুদ্ধ পরিশুদ্ধ সোনায় রূপান্তরিত করেছ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আজ কেবলমাত্র একজন আহমদী মুসলমানই, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর দেখানো স্বর্ণালী নীতিমালা এবং মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আদর্শ অনুসরণ করে সর্বোচ্চ স্তরের অগ্রগতি লাভ করছে-এবং অবশ্যই তা অব্যাহত রাখা উচিত।

এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"সুতরাং আমাদের নৈতিক মান সর্বাবস্থায় উৎকৃষ্ট থাকা আজ একজন আহমদীর বৈশিষ্ট্য হওয়া অপরিহার্য। আজ মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাতের মূল কারণ হলো তাদের নৈতিক মানের অবনতি। মানুষ মহানবী (সা.) - এর পত্রি আদর্শ ভুলে গেছে, এবং শুধু মৌখিক দাবি অবশিষ্ট রয়েছে।

সুতরাং, যদি আমাদের সত্যিকারের আনন্দ উদযাপন করতে হয়, তবে তা কেবল মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব-যেখানে ইবাদতের মান উন্নীত হয়, যেখানে আল্লাহর একত্বে পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, এবং যেখানে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান বিরাজ করে।

যদি এই গুণগুলো অনুপস্থিত থাকে, তবে আমাদের এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। যদি আমরা নিজেরাই এই শিক্ষাসমূহ অনুসরণ না করি, তবে আমাদের এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না যারা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় আছে এবং অস্থায়ী নেতা ও তথাকথিত আলেমদের অনুসরণ করে মানুষের জন্য কষ্ট সৃষ্টি করছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি আনুগত্যের শপথ দাবি করে যে, প্রতিটি বিষয়ে আমাদের সামনে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আদর্শ রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এটা করার তাওফীক দান করুন।" (শুক্রবারের খুতবা, ১ ডিসেম্বর ২০১৭)

এই নিবন্ধটি হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) এর শেখানো মহানবী (সা.)- এর উপর দরূদের দোয়া দিয়ে শেষ করব। তিনি বলেন: "সেই মানব যিনি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম, পরিপূর্ণ মানুষ, পরিপূর্ণ নবী এবং যিনি পরিপূর্ণ বরকতসহ এসেছিলেন-যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও সমাবেশের দ্বারা বিশ্বের প্রথম পুনরুত্থান প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যাঁর আগমনে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত এক বিশ্ব জীবিত হয়ে উঠেছিল-তিনিই সেই বরকতময় নবী, নবীদের সীলমোহর, নির্বাচিতদের নেতা, রসূলদের সীলমোহর, নবীদের গর্ব, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

হে প্রিয়তম আল্লাহ! এই প্রিয় নবীর উপর এমন রহমত ও বরকত প্রেরণ করো যা বিশ্বের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কারো উপর প্রেরণ করোনি।

হে আল্লাহ! তাঁর উপর, তাঁর পরিবারের উপর এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর তোমার বরকত, শান্তি এবং প্রচুর অনুগ্রহ প্রেরণ করো। আর আমাদের দোয়ার শেষ কথা এই যে: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতসমূহের প্রভু।"

(ইতমামুল হুজ্জাহ, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ৮, পৃ. ৩০৮)

হে আমার প্রভু! তোমার নবীর উপর চিরকাল বরকত প্রেরণ করো,
এই দুনিয়ায় এবং দ্বিতীয় পুনরুত্থানে।
আমীন। ওয়া আখারী দাওয়ানা আনিল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত
ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজ সংশোধনের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থা

মহম্মদ উমর তিমাপুরী, মৈসুর, কর্নাটক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন শিরক ও মূর্তিপূজা সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। কুফর ও পথভ্রষ্টতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জড়বাদ এবং মহান আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানুষের স্বভাবের অংশ হয়ে গিয়েছিল। পথভ্রষ্টতাকেই সরল পথ মনে করা হতো এবং মানবতার পরিপন্থী প্রতিটি অকল্যাণ সমাজে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতি ও এমন পরিবেশেও আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর অত্যন্ত পবিত্রতা ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। লেনদেনে তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সাধারণ মানুষ তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত, তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করত এবং নিজেদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে আমানত রাখত। সংক্ষেপে, উত্তম চরিত্রের সব নিদর্শনই তাঁর পবিত্র জীবনে বিদ্যমান ছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মায়ের কোলে থাকা অবস্থা থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব সমাজ ও চারপাশের পরিবেশের সামান্যতম প্রভাবও গ্রহণ করেননি। বরং টানা চল্লিশ বছর তিনি সমাজের অসংখ্য অনাচার ও দুর্নীতি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অন্তরে গভীরভাবে বেদনাবোধ করেছেন যে, কীভাবে এসব অন্যায় ও অসততা দূর করা যায়। এটা স্পষ্ট যে, উন্নত ও কল্যাণকর জীবন এবং একটি পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল-যে বিপ্লব তিনি সংঘটিত করেছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি সর্বাঙ্গীন ও সর্বব্যাপী সংস্কারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন, যার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য, মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সবার জন্য অনুসরণ করা সহজ। এর ওপর আমল করলে শুধু অনাচার দূর হবে না, বরং মানবজাতি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগও লাভ করবে।

তাঁর পবিত্র আবির্ভাবের আগে সারা বিশ্বে দাস ও প্রভুর মধ্যে গভীর বৈষম্য ছিল। রাজা ও শাসকদের "ঈশ্বরের ছায়া" বলা হতো। তাঁদের হাতে দেবত্বসদৃশ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। তাঁরা সবকিছুর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথাই ছিল আইন। তাঁদের প্রতিটি আদেশ পালন করা ছিল বাধ্যতামূলক। সমাজ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চবিত্ত ও ক্ষমতাবানরা সব ধরনের আইনের উর্ধ্বে ছিল। দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে দারিদ্র্যের জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হতো। মানবতা যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মানুষ কৃত্রিম জাতিভেদ ও উচ্চ-নীচ শ্রেণিবিভাজনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

মানবতার হিতৈষী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সব বাধা দূর করে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেন। তিনি মানবমর্যাদাকে উন্নত করেন, মানবসমতার প্রচার করেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন-

"হে মানুষ! সাবধান! তোমাদের প্রতিপালক একজন। তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) একজন। আর ভালোভাবে শুনে রাখো, কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবেরও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গেরও শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একমাত্র তাকওয়া ও ধার্মিকতার ভিত্তি ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেজগার।"

শ্রেষ্ঠত্ব বংশ, বর্ণ, ভাষা, জন্মভূমি, সম্পদ বা দারিদ্র্যের ভিত্তিতে নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম নিয়ত, সৎকর্ম এবং উত্তম চরিত্রই মহত্ত্ব ও মর্যাদার প্রকৃত ভিত্তি।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আইনের দৃষ্টিতে ছোট-বড়, চাকর-প্রভু, দাস-মালিক, গরিব-ধনী, প্রজা-শাসক-সকলেই সমান। আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত সবার জন্য সমানভাবে অপরিহার্য। কোনো সেনাপতি, শাসক বা ধর্মীয় নেতা মানুষের কাছ থেকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের আনুগত্য আদায় করার অধিকার রাখে না।

সমস্ত মানুষ সমান। "তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।"

সত্য পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চরম শত্রুদেরও ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং যারা ইসলামের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল, তাদের সবাইকে পরস্পরের ভাইয়ে পরিণত করেছিলেন। তিনি বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা ও প্রতিহিংসার অবসান ঘটান। তিনি মানবজাতির প্রতি দয়া ও সহানুভূতির বার্তা দেন। তিনি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের মর্যাদা শিক্ষা দেন। তিনি মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রেও অত্যাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি প্রতিবন্ধী ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা এবং যুদ্ধবন্দীদের নির্যাতন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন।

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের আগে সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা বা অবস্থান ছিল না। সর্বত্র তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হতো এবং কেবল দাসীর মর্যাদা দেওয়া হতো। নারী ছিল কেনাবেচার বস্তু এবং বাজারে মানুষকে আকৃষ্ট করার উপকরণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকে অপমান ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে তুলে এনে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেন। তিনি নারীকে মানবজাতির অর্ধাংশ বলে ঘোষণা করেন। তিনি নারীর উপার্জনের ওপর তাঁর মালিকানা এবং সম্পত্তিতে তাঁর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেন। মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন-প্রত্যেক পরিচয়ে তিনি নারীর মর্যাদা উন্নীত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, পুরুষ ও নারী পরস্পরের জন্য শান্তি, স্বস্তি ও প্রয়োজনের উৎস। তিনি নারীর সতীত্ব ও লজ্জাশীলতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেন। তিনি সৎকর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। তিনি বলেন, সম্মান ও মহিমার অধিকারী আল্লাহ তাকওয়া ও ধার্মিকতার প্রতি দৃষ্টি দেন; তিনি দেখেন না কেউ পুরুষ না নারী।

বিদায় হজের সময় তিনি বলেন, "নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে।"

একইভাবে তিনি দাসী ও দাসদের মুক্ত করার এবং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এর মাধ্যমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সেই প্রথার অবসান ঘটান। তিনি তাঁর যুগে পর্দা প্রথার প্রচলন করেন। গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কাম্য মনে করা হতো না; তবে নারীরা পর্দা রক্ষা করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা শুধু মসজিদে খুতবা শুনতেন না, প্রয়োজন হলে যুদ্ধেও অংশ নিতেন।

নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে আরব সমাজের ধর্মীয় অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সেখানে তিনশো ষাটটি মূর্তির উপাসনা করা হতো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল মানুষের অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। তিনি পরকালের জবাবদিহির বিশ্বাসকে মানুষের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মানুষের হৃদয় ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান অনুসরণে প্রস্তুত করেন। তিনি মানুষের হৃদয়কে সৎকর্ম ও নৈতিকতার দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সৃষ্টির সেবার চেতনা সৃষ্টি করেন। তিনি মন্দ ও অকল্যাণকর কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেন। তিনি লজ্জাশীলতা, সতীত্ব ও পবিত্রতাকে ঈমানের অপরিহার্য অংশ ঘোষণা করেন। এভাবে তিনি একটি পবিত্র সমাজ গঠনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন।

ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের পাশাপাশি তিনি পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করার নীতিমালাও নির্ধারণ করেন। তিনি পরিবার গঠনে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব নির্ধারণ করেন এবং মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে, ভাই ও বোনের পারস্পরিক সম্পর্কের সুষ্ঠু রূপরেখা প্রদান করেন। তিনি বিবাহকে একটি কাম্য ও কল্যাণকর কাজ হিসেবে ঘোষণা করেন। এসব পদক্ষেপ সমাজের সামগ্রিক পরিবেশে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

এত অসাধারণ সাফল্য অর্জনের পরও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো স্বৈরাচারী সম্রাটের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এটাই তাঁর চিরন্তন মহত্ত্বের অকাট্য প্রমাণ। একজন নবী হিসেবে তিনি যে রাষ্ট্রপরিচালনার আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন, তা ছিল একটি কল্যাণমুখী ও জনহিতৈষী রাষ্ট্রের সর্বোত্তম সংবিধান। ইসলামী সমাজকে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রে রূপ দেওয়া এবং তার নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত শাসকদের জন্য পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। তিনি আরবদের গোত্রীয় সংকীর্ণতা দূর করে তাঁদের সীসা-গলিত প্রাচীরের মতো দৃঢ় ঐক্যে পরিণত করেছিলেন। তিনি তাঁদের সামনে শুধু জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যই উপস্থাপন করেননি, বরং সেই লক্ষ্য অর্জনে তাঁদের সক্রিয়ও করে তুলেছিলেন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

****

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

আব্দুল্লাহর বিবাহ

আসহাবে ফীল(হস্তীওয়ালাদের) ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে, আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহর বিবাহ আয়োজন করেন আমিনা বিনতে ওয়াহবের সাথে, যিনি ছিলেন কুরাইশের বনু যুহরাহ গোত্রের একটি সম্মানিত পরিবারের অত্যন্ত মহৎ বংশের এক যুবতী। সে সময় আব্দুল্লাহর বয়স পঁচিশ বছর ছিল, অথবা কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে সতেরো বছর। একই অনুষ্ঠানে আব্দুল মুত্তালিব নিজে হালাহ বিনতে ওয়াহবকে বিবাহ করেন, যিনি আমিনার চাচাতো বোন। হামজাহ হালাহ থেকে জন্মগ্রহণ করেন।

আব্দুল্লাহর মৃত্যু

আল্লাহর ইচ্ছায় আব্দুল্লাহকে তাঁর বিবাহের পর খুব বেশি সময় দেওয়া হয়নি। অল্পকাল পরেই, যখন তিনি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ভ্রমণে যান, তখন ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইয়াসরিবে অবস্থান করেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর বনু নাজ্জার গোত্রের আত্মীয়দের মধ্যে সমাহিত হন। সে সময় তাঁর স্ত্রী আমিনা সন্তানসম্ভবা ছিলেন।

আব্দুল্লাহ যে উত্তরাধিকার এই সন্তানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, যিনি তখনও তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য। এতে পাঁচটি উট, কয়েকটি ছাগল এবং উম্মে আয়মান নামক এক দাসী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটিই ছিল সেই উত্তরাধিকার যা দুই জগতের বাদশাহ হওয়ার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তির জন্য রেখে যাওয়া হয়েছিল।

যখন আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহর অসুস্থতার খবর পান, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হারিসকে মদিনায় পাঠান যাতে সে আব্দুল্লাহকে নিয়ে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যখন হারিস মদিনায় পৌঁছান, ততক্ষণে আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে জানান যে তাঁর প্রিয় পুত্র এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সে মুহূর্তে আব্দুল মুত্তালিব যে শোক অনুভব করেছিলেন তা কল্পনা করা যায় মাত্র। তবুও আরও বড় শোক নিশ্চয়ই আমিনার হৃদয়ে আঘাত করেছিল, যাঁর স্বামী ঘর থেকে দূরে থাকাকালীন বিবাহের অল্প সময় পরেই তাঁকে বিচ্ছেদের বেদনা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। যুবতী বধূরা, যাঁরা স্বভাবতই অধিক লজ্জাশীলতা ও সংযমের অধিকারিণী, এমন পরিস্থিতিতে প্রায়শই তাঁদের শোক প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে অক্ষম হন। তাঁদেরকে অন্তরে শোক সহ্য করতে বাধ্য হতে হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে হযরত আমিনা সে সময় কতটা কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

তবে আল্লাহর সান্ত্বনা শীঘ্রই আমিনাকে সাহায্য করতে এসেছিল। সেই দিনগুলিতেই তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যাতে তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন এবং স্বপ্নে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাঁর নাম মুহাম্মদ রাখবেন। তিনি আরও দেখেন যে তাঁর অভ্যন্তর থেকে এক উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসে এবং দূর-দূরান্তের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

জন্মের শুভক্ষণ

আমিনা যে আলো দেখেছিলেন তার প্রকাশের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছিল এবং প্রসবের দিনগুলি আসন্ন হয়ে পড়ছিল। তিনি বনু হাশিমের পাড়ায় বাস করছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন সেই মুহূর্তের যখন তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতি সংরক্ষণকারী সন্তান এই দুনিয়ার আলোয় আসবেন এবং তাঁর শোকাহত হৃদয়ের জন্য সান্ত্বনা ও সান্ত্বনার উৎস হবেন।

সেই অনুসারে, আসহাবে ফিল(হস্তীওয়ালাদের ঘটনা)-র পঁচিশ দিন পর, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে, যা ২০ আগস্ট ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের সাথে মিলে যায়, অথবা আরও সাম্প্রতিক এবং সম্ভবত আরও সঠিক গবেষণা অনুসারে, রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখে, যা সোমবার, ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের সাথে মিলে যায়, সকালবেলায়, মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেন।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম হস্তীর ঘটনার এত শীঘ্র পরে হওয়ার মধ্যে একটি ঐশ্বরিক ইঙ্গিত ছিল যে, যেমন আল্লাহ কাবার বিরুদ্ধে এই বাহ্যিক আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, তেমনি এখন সময় এসেছে মিথ্যা উপাসনাকে আল্লাহর সত্য ধর্মের সামনে চূর্ণ করার। পবিত্র কুরআনে হস্তীওয়ালাদের আক্রমণের উল্লেখও বাহ্যিকভাবে এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে মনে হয়।

যাই হোক, সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে খবর পাঠালেন। খবর শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে তৎক্ষণাৎ আমিনার কাছে এলেন। আমিনা তাঁর সামনে ছেলেকে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন যে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে তাঁর নাম মুহাম্মদ। আব্দুল মুত্তালিব শিশুটিকে কোলে নিলেন এবং আল্লাহর ঘরে নিয়ে গেলেন, যেখানে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং শিশুটির নাম মুহাম্মদ রাখলেন, যার অর্থ "অত্যন্ত প্রশংসিত"। তারপর তিনি তাঁকে ফিরিয়ে এনে আনন্দের সাথে আবার তাঁর মায়ের কাছে সমর্পণ করলেন।

ইতিহাসবিদগণ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন অসাধারণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা লিখেছেন যে সে সময় পারস্য সম্রাট খসরুর প্রাসাদে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল, যার ফলে তার চৌদ্দটি যুদ্ধবুরুজ ধসে পড়ে; পারস্যের পবিত্র অগ্নি যা শতাব্দী ধরে অবিরাম জ্বলছিল তা হঠাৎ নিভে যায়; কিছু নদী ও ঝরনা শুকিয়ে যায়; এবং তাঁর নিজের ঘরেও বিভিন্ন অসাধারণ নিদর্শন প্রকাশ পায়। তবে এসব বর্ণনা সাধারণত দুর্বল।

এছাড়াও একটি বর্ণনা আছে, যা সম্ভবত সহীহ, যে তাঁর জন্মের আশেপাশে আকাশে অস্বাভাবিকভাবে বেশি সংখ্যক উল্কাপাত দেখা গিয়েছিল।

একইভাবে, আরেকটি বর্ণনা আছে যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বাভাবিকভাবে খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদি এটি সঠিক হয়, তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ নবজাতক শিশুদের মধ্যে এমন স্বাভাবিক ঘটনা কখনো কখনো দেখা গিয়েছে।

আরেকটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যা তিনি অর্জন করেছিলেন তা হলো তাঁর পিঠের বাম পাশে একটি উঁচু মাংসপিণ্ড, যা মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত নবুয়তের মোহর নামে পরিচিত।

দুগ্ধপান এবং শৈশবকাল

মক্কার অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে এটি রীতি ছিল যে মায়েরা নিজের সন্তানদের দুধ না খাওয়ান। পরিবর্তে, শিশুদের সাধারণত শহরের বাইরে বাসকারী বেদুইন গোত্রের ধাত্রীদের কাছে সমর্পণ করা হতো। এই প্রথার সুবিধা ছিল যে শিশুরা মরুভূমির তাজা খোলা বাতাসে বেড়ে উঠতো, সুস্থ ও শক্তিশালী হতো এবং তারা আরবি ভাষার বিশুদ্ধ ও বাগ্মী রূপ অর্জন করতো।

শুরুতে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের দ্বারা এবং তারপর সুওয়াইবাহের দ্বারা দুধ পান করানো হয়। সুওয়াইবাহ ছিলেন তাঁর চাচা আবু লাহাবের দাসী, যিনি তাঁর এতিম ভাতিজার জন্ম উপলক্ষে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। একই সুওয়াইবাহ হযরত হামজাহকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। এভাবে হামজাহ, যিনি রক্তের সম্পর্কে নবীর চাচা ছিলেন, দুগ্ধপানের মাধ্যমে তাঁর দুধভাইও হয়ে গেলেন।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুওয়াইবাহের কয়েক দিনের সেবা কখনো ভুলে যাননি। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তিনি তাকে সাহায্য করে যেতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও জিজ্ঞাসা করতেন যে তিনি কোনো আত্মীয় রেখে গেছেন কি না। তবে দেখা গেল যে তাঁর কেউ ছিল না।

সুওয়াইবাহের পর, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থায়ীভাবে হালিমাহর তত্ত্বাবধানে সমর্পিত হন, যিনি হাওয়াজিন গোত্রের বনু সাদ শাখার এক মহিলা। তিনি অন্যান্য মহিলাদের সাথে মক্কায় এসেছিলেন একটি শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য খুঁজতে।

প্রথমে, হালিমাহ একজন এতিম শিশুকে সাথে নিয়ে যেতে খুশি ছিলেন না, কারণ তিনি আশা করছিলেন যে জীবিত পিতার সন্তান পাবেন, যার কাছ থেকে আরও বেশি পুরস্কার ও উপহার আশা করা যায়। সেই অনুসারে, তিনি প্রথমে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিতে ইতস্তত করেছিলেন। তবে যখন আর কোনো শিশু অবশিষ্ট ছিল না এবং তাঁর সাথী সকল মহিলারা শিশু পেয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি খালি হাতে ফিরে না যাওয়াই ভালো মনে করলেন এবং তাঁকে সাথে নিলেন।

শীঘ্রই অবশ্য হালিমা বুঝতে পারলেন যে যে শিশুকে তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন তিনি মহান মর্যাদার জন্য নির্ধারিত। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুসারে, মহানবী (সা.)-এর আগমনের আগে তাঁরা চরম দুর্দশায় বাস করছিলেন, কিন্তু তাঁর আসার সাথে সাথে তাঁদের দুর্দশা প্রাচুর্যে পরিণত হয় এবং তাঁদের যা কিছু ছিল তাতে বরকত দেখা দিতে শুরু করে।

হালিমার নিজের ছেলে, যিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দুধ পান করেছিলেন, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। তাঁর আরেকজন বড় মেয়ে ছিলেন শায়মা, যিনি পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন।

দুই বছর পর, যখন দুগ্ধপানের সময়কাল সম্পূর্ণ হয়, হালিমাহ রীতি অনুসারে তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তবে তিনি পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি যদি সম্ভব হয় তাঁর মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁকে আবার সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলেন, "এই শিশুটিকে আর কিছু সময় আমার কাছে রাখতে দিন। আমি তাঁর যথাসাধ্য যত্ন নেব।"

প্রথমে আমিনা অস্বীকার করলেন, কিন্তু হালিমাহর জোরাজুরি দেখে এবং মক্কার বাইরের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর বিবেচনা করে, বিশেষ করে সে সময় মক্কার আবহাওয়া কিছুটা প্রতিকূল ছিল, তিনি সম্মত হলেন। হালিমাহ আনন্দের সাথে তাঁকে আবার তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

এরপর পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় চার বছর বয়স পর্যন্ত হালিমাহর সাথে থাকলেন। তিনি বনু সাদ গোত্রের ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করে বেড়ে উঠলেন। এই গোত্রের উপভাষা বিশেষভাবে বিশুদ্ধ ও বাগ্মী ছিল এবং এই ভাষাই পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিখেছিলেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিযকদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনচরিত (সীরাত) এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

মহম্মদ কলীম খান, মুবাল্লিগ সিলসিলা

হযরত মুহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর মহান সঙ্গীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হন। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন: "আমি তোমার জন্য তোমার স্মরণকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি–অর্থাৎ তাঁর প্রশংসা চিরকাল অব্যাহত থাকবে এবং তাঁর মর্যাদা ও উচ্চতা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁর অসাধারণ কীর্তি ছিল সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি একটি পরিপূর্ণ ও কল্যাণকর আদর্শ স্থাপন করেছেন।

জাতি ও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলেও, এই ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো তুলনা নেই। তাঁর ভূমিকা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রেখেছেন। পৃথিবীতে অবশ্যই বহু ধর্ম রয়েছে–যেমন ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, ইহুদিধর্ম, হিন্দুধর্ম, জরথুস্ত্রবাদ, শিখধর্ম এবং আরও অন্যান্য ধর্ম। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিটি দেশেই আরও নানা ধর্ম প্রচলিত রয়েছে। কিছু ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি অধিকাংশ ধর্মকে বিভিন্ন মতবাদ বা চিন্তাধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদি আমরা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন পর্যালোচনা করি, তবে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মীয় নেতার চরিত্রের তুলনা করা যায় না।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি বিশেষ গুণ রেখেছেন। আবার গুণের মধ্যেও বিভিন্ন গুণ রয়েছে। যেমন লোহা, তামা এবং এ ধরনের ধাতুর বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করে। আবার পানির এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তা কখনো গরম, কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং পরে বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। লোহা বা তামার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কি না, তা টেস্টারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়। একইভাবে থার্মোমিটারের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

ঠিক তেমনি, মহান আল্লাহ "সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব" অর্থাৎ মানুষের মধ্যেও বহু গুণ দান করেছেন। মানুষের মধ্যে যেমন ভালোবাসা আছে, তেমনি ঘৃণাও আছে। কিন্তু যখন আমাদের প্রিয় প্রভু, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সারাংশ, হযরত মুহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলির কথা আসে, তখন বাস্তবতা হলো– সমস্ত পরিপূর্ণতাই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

"তাঁর মধ্যে সাহস ছিল, উদারতা ছিল, মানবসেবা ছিল, বিশ্বস্ততা ছিল, সহিষ্ণুতা ছিল, দয়া ছিল, ক্ষমাশীলতা ছিল, আত্মত্যাগ ছিল, সততা ছিল, ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল, বিনয় ছিল, আত্মমর্যাদাবোধ ছিল, কৃতজ্ঞতা ছিল, অবিচলতা ছিল, গাম্ভীর্য ছিল, মানবজাতির প্রতি কল্যাণকামিতা ছিল, উচ্চমনা স্বভাব ছিল, ধৈর্য ছিল, সহমর্মিতা ছিল, অকল্যাণের মোকাবিলার শক্তি ছিল, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ছিল, অধ্যবসায় ছিল, সরলতা ছিল, আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণ ছিল, সত্যবাদিতা ছিল, দরিদ্রদের প্রতি যত্ন ছিল, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা ছিল, অতিথিপরায়ণতা ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান ও কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহ ছিল, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ছিল, আল্লাহর ওপর ভরসা ছিল, ইবাদতের সংরক্ষণ ছিল। সংক্ষেপে, এমন কোন উৎকর্ষ ছিল না যা তাঁর মধ্যে ছিল না, আর এমন কোন পরিপূর্ণতা ছিল না যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না?

(তাফসিরে কবীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০০, সুরা ত্বা-হা-এর তাফসির, কাদিয়ান সংস্করণ ২০০৪)

এই পরিপূর্ণতার গুণাবলি উপলব্ধি করার জন্য টেস্টার বা থার্মোমিটারের মতো কোনো বাহ্যিক যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। বরং এর জন্য প্রয়োজন রত্নবিশারদের মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন একজন মানুষ।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যক্তিত্বেই এর সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট রূপ পরিলক্ষিত হয়। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। নবুওয়ত লাভের পূর্বেই তাঁর সামনে একটি বিস্ময়কর ও বিরোধপূর্ণ ঘটনা উপস্থিত হয়েছিল। সেটি ছিল হাজরে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত ঘটনা। হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ., কমারুল আম্বিয়া (রা.) লিখেছেন–

"কুরাইশরা যখন কাবা পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের স্থানে পৌঁছল, তখন কোন গোত্র এটি নিজ স্থানে স্থাপন করবে, তা নিয়ে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক গোত্রই এই সম্মান নিজেদের জন্য চাইছিল। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কেউ কেউ জাহেলিয়াতের রীতি অনুযায়ী রক্তভর্তি একটি পাত্রে নিজেদের আঙুল ডুবিয়ে শপথ করল যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করবে, কিন্তু এই সম্মান অন্য কোনো গোত্রকে দেবে না। এই বিরোধের কারণে কয়েক দিন ধরে নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। অবশেষে আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা প্রস্তাব করলেন যে, হারামে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তাকেই বিচারক মানা হবে এবং তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। আল্লাহর অপার ক্ষমতায় যখন সবাই দৃষ্টি তুলল, তখন তারা দেখল, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমীন! আমীন!' এবং সর্বসম্মতিক্রমে বলল, 'আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।' তিনি কাছে এলে তারা সমগ্র ঘটনা তাঁকে জানিয়ে তাঁর রায় প্রার্থনা করল। মহান আল্লাহর সাহায্যে তিনি এমন একটি সিদ্ধান্ত দিলেন, যাতে কুরাইশদের সব গোত্রপ্রধান বিস্মিত হয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন। তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে তার ওপর হাজরে আসওয়াদ রাখলেন এবং কুরাইশদের সব গোত্রের নেতাদের সেই চাদরের চার কোণা ধরতে বললেন। এরপর সবাই মিলে চাদরটি তুলে ধরল এবং কারও কোনো অভিযোগ রইল না। এটি ছিল চিত্ররূপে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ইঙ্গিত যে, আরবের যেসব গোত্র তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তারা একদিন এই পবিত্র সত্তার মাধ্যমে একটি কেন্দ্রের অধীনে একত্রিত হবে। চাদরটি হাজরে আসওয়াদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছলে তিনি নিজের মোবারক হাতে পাথরটি তুলে যথাস্থানে স্থাপন করে দেন।" (সীরাত খাতামুন নবিয়্যীন, পৃষ্ঠা ১০৯, যুক্তরাজ্য সংস্করণ ১৯৯৬)

এভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁকে নবুওয়ত ও রিসালাতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ধর্মের নামে যে সকল দল ও সম্প্রদায় বিদ্যমান, তাদের সবার মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় হলো–মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস। নাস্তিক বা বেধর্মীদের বাদ দিলে, যারা ধর্মীয় মানুষ বলে পরিচিত, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে। এটি অস্বীকার করাকে কেবল ধর্মহীনতাই বলা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে–অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব সম্পর্কে–তিনি কখনো কোনো আপস করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়, তাঁর অনুসারীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয় এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয়ে আপস করার নানা প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, নানা প্রলোভনও দেখানো হয়। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যদি তাঁর ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে রাখা হয়, তবুও তিনি এই পবিত্র উদ্দেশ্য থেকে একচুলও সরে দাঁড়াবেন না। কারণ আল্লাহর একত্বের প্রশ্নে কোনো ধর্মীয় সম্প্রীতির অবকাশ নেই। আর এই কারণেই তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন, যেখানে তিনি পৃথিবীর সামনে ধর্মীয় সম্প্রীতির অমূল্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বাস্তবতা হলো, মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর তিনি যে অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, সেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করত। বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল সময়ের দাবি। মদিনায় আগমনের সময় হযরত মুহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে যে অসাধারণ গুণাবলি দান করেছিলেন, তার মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার গুণ ছিল অন্যতম। পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তিনি সব ধর্ম ও মতবাদের প্রতিনিধিদের একত্রিত করেন এবং তাঁদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা সবাই গ্রহণ করে। এই চুক্তিই "মিসাকে মদিনা"বা "মদিনার সনদ"নামে পরিচিত। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গে মদিনার সনদের বক্তব্য নিম্নরূপ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

"এটি আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুমিনগণ এবং তাঁদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগদানকারী সকল মানুষের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। মুহাজিরদের মধ্যে কেউ নিহত হলে, তাঁর রক্তপণের দায়িত্ব তারা (মুমিনরা) বহন করবে এবং নিজেদের বন্দিদের মুক্ত করার ব্যবস্থাও তারা নিজেরাই করবে। মদিনার বিভিন্ন মুসলিম গোত্রও একইভাবে তাদের নিজ নিজ গোত্রের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে। যে ব্যক্তি বিদ্রোহ ছড়াবে, শত্রুতা সৃষ্টি করবে অথবা সমাজব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, চুক্তির সব পক্ষ তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবে, এমনকি সে যদি তাদের নিজের সন্তানও হয়। কোনো মুসলমান যদি যুদ্ধে কোনো অবিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে সেই অবিশ্বাসীর মুসলিম আত্মীয়রা ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে না এবং কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন অবিশ্বাসীকে সাহায্যও করবে না। যে কোনো ইহুদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আমরা সবাই তাকে সাহায্য করব। ইহুদিদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকেও সাহায্য করা হবে না। কোনো অমুসলিম মক্কার লোকদের নিজের ঘরে আশ্রয় দেবে না, তাদের সম্পদ নিজের কাছে আমানত হিসেবে রাখবে না এবং অবিশ্বাসী ও মুমিনদের মধ্যকার যুদ্ধে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তবে সব মুসলমান তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোনো মুশরিক শত্রু যদি মদিনায় আক্রমণ করে, তবে ইহুদিরা মুসলমানদের সহায়তা করবে এবং যুদ্ধব্যয়ের নিজ নিজ অংশ বহন করবে। মদিনার বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে যেসব ইহুদি গোত্র চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তারা মুসলমানদের মতোই সমান অধিকার ভোগ করবে। ইহুদিরা তাদের নিজ

ধর্মে অবিচল থাকবে এবং মুসলমানরা তাদের নিজ ধর্মে অবিচল থাকবে। ইহুদিদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের অনুসারীরাও সেই একই অধিকার ভোগ করবে। মদিনাবাসীদের মধ্যে কেউ আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুমতি ছাড়া কোনো যুদ্ধ শুরু করবে না। তবে এই শর্তের কারণে কাউকে তার ন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থার ব্যয় নিজেরাই বহন করবে; কিন্তু যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ একসঙ্গে কাজ করবে। এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষের জন্য মদিনা একটি পবিত্র স্থান হবে। শহরবাসীর সমর্থনে কোনো বহিরাগত ব্যক্তি এলে, তার সঙ্গে শহরের মূল অধিবাসীদের মতোই আচরণ করা হবে। তবে কোনো নারীকে তার আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদিনাবাসীরা নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিতে পারবে না। সব বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। এই চুক্তির কোনো পক্ষ মক্কার লোকদের কিংবা তাদের মিত্র গোত্রগুলোর সঙ্গে কোনো পৃথক চুক্তি করবে না। কারণ এই চুক্তির মাধ্যমে তারা ইতোমধ্যেই মদিনার শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। যেমন যুদ্ধ পৃথকভাবে পরিচালিত হতে পারে না, তেমনি পৃথকভাবে শান্তিচুক্তিও করা যাবে না। তবে কাউকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না। কিন্তু কেউ যদি অত্যাচার করে, তবে সে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককার ও পরহেজগারদের রক্ষাকারী, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।"

(তাফসিরুল কুরআনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩, কাদিয়ান সংস্করণ ২০১০ থেকে উদ্ধৃত)

ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

তিনি সর্বদা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাওহীদের বিষয়ে কোনো বিরোধিতার পরোয়া করেননি, কোনো আপসও করেননি। তবে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে কিছু ছাড় দেওয়া সম্ভব ছিল। তিনি সেই ছাড় দিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির চেতনাকে অক্ষুন্ন রেখে প্রতিপক্ষের এমন কিছু শর্তও গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর অনেক সম্মানিত সাহাবির (রা.) কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর সমঝোতাপূর্ণ মনোভাবই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, সেই সন্ধিপত্রে দুই পক্ষের এক পক্ষের নেতা নিঃসন্দেহে ছিলেন আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু প্রতিপক্ষ "মুহাম্মদ" নামের সঙ্গে "আল্লাহর রসুল" উপাধি লিখতে সম্মত হয়নি। তিনি নিজে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও, অন্যের মাধ্যমে "আল্লাহর রসুল" কথাটি চিহ্নিত করে নিয়ে নিজের মোবারক হাতে সেটি মুছে দিয়েছিলেন।

তবুও, এই শান্তিচুক্তি সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"আল্লাহর নামে। এই শান্তিচুক্তির শর্তাবলি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মক্কা সরকারের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যে সম্পাদিত হলো। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যোগ দিতে বা তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, সে তা করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দিতে বা তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, সেও তা করতে পারবে। যদি এমন কোনো বালক, যার পিতা জীবিত আছেন, অথবা যে এখনো অল্পবয়সী, তার পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসে, তবে তাকে তার পিতা বা অভিভাবকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোনো সাহাবি কুরাইশদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। তবে আগামী বছর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ মক্কায় আসতে পারবেন, সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন এবং কাবা শরিফ তাওয়াফ করবেন। এই সময়ে কুরাইশরা শহর ছেড়ে পাহাড়ে চলে যাবে। তবে শর্ত হলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করবেন, তখন তাঁদের সঙ্গে কোনো অস্ত্র থাকবে না, কেবল সেই অস্ত্র ব্যতীত যা প্রত্যেক সফরকারী সঙ্গে রাখে-অর্থাৎ খাপে রাখা একটি তরবারি।" (তাফসিরুল কুরআনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৯১)

ধর্মীয় সম্প্রীতির এই নমনীয় চুক্তির তাৎপর্য সে সময় কিছু সাহাবি (রা.) অনুধাবন করতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ঘটনাকেই "সুস্পষ্ট বিজয়" (ফাতহে মুবীন)-এ পরিণত করেছিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা ছিল কুরাইশ বা মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধর্মীয় জগতে দ্বিতীয় বড় সম্প্রদায় হলো খ্রিস্টানরা। খ্রিস্টানদের সঙ্গেও ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী ঘটনাবলিতে প্রকাশ পায়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ মরহুম মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শহীদ এভাবে লিখেছেন-

"মক্কা মুকাররমা থেকে ইয়েমেনের পথে সাত দিনের দূরত্বে ছিল নাজরানের খ্রিস্টান রাষ্ট্র। সেখানে একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা ছিল, যাকে তারা 'নাজরানের কাবা' বলত এবং কাবা শরিফের হারামের সমতুল্য মনে করত। এই কাবাটি তিনশত চামড়া দিয়ে গম্বুজাকারে নির্মিত হয়েছিল। আরবের খ্রিস্টানদের আর কোনো ধর্মীয় কেন্দ্র এর সমকক্ষ ছিল না। এই রাষ্ট্রের প্রশাসন তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। বহির্বিষয়ক ও সামরিক বিভাগের প্রধানকে বলা হতো 'সাইয়্যিদ'। পার্থিব বিষয়সমূহের দায়িত্ব ছিল 'আকিব'-এর ওপর এবং ধর্মীয় বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন 'বিশপ' (লর্ড বিশপ)। এই ধর্মীয় নেতাদের নিয়োগ দিতেন স্বয়ং রোমের সম্রাট। (মুজামুল বুলদান, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৯৬৩)

পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য রাজাদের ন্যায় তাদের কাছেও দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করেন। হিজরির সপ্তম বছরে নাজরান থেকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হয়। এই প্রতিনিধি দলে ষাটজন সদস্য ছিলেন এবং রাষ্ট্রের তিনজন প্রধানও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন-আবদুল মাসীহ (আকিব), শারজিল বা আসিম (সাইয়্যিদ) এবং আবু হারিসা ইবনে আলকামা (বিশপ)। এই প্রতিনিধি দল রাজকীয় জাঁকজমকসহ পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। নবী (সা.) তাদের মসজিদে নববিতে থাকার ব্যবস্থা করেন। কিছুক্ষণ পরে যখন তাদের উপাসনার সময় হলো, তখন শান্তির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুমতিতে তারা মসজিদে নববিতেই নিজেদের ধর্মীয় পদ্ধতিতে উপাসনা সম্পন্ন করেন।"

(ওফাতে মাসীহ ও ইহইয়ায়ে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৪, রবওয়া সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭৯; মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শহীদ থেকে উদ্ধৃত)

এরপর এলো মক্কা বিজয়ের গৌরবময় যুগ। তাঁর সামনে তখন এমন লোকেরাও উপস্থিত ছিল, যারা গুরুতর যুদ্ধাপরাধী ছিল। ন্যায়বিচারের দাবি ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। কিন্তু তিনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাদের মধ্যে অনেককেই ক্ষমা করে দেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের ঘটনা। তাকেও শান্তি প্রদান করা হয়েছিল। এমনকি সে তখনো নিজ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থাতেই তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

এরপর এলো বিদায় হজের ঘটনা। এই উপলক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বজনীন শান্তির নির্দেশাবলি ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন, এই ঘোষণা যেন যুগে যুগে, দেশে দেশে পৌঁছে দেওয়া হয়। বিদায় হজের ভাষণের প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"তোমরা সকল মানুষ, জাতি বা মর্যাদা যাই হোক না কেন, মানবত্বের দিক থেকে সবাই সমান।" এ কথা বলতে বলতে তিনি উভয় হাত উঁচু করলেন এবং দুই হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, "যেমন এই দুই হাতের আঙুলগুলো একে অপরের সমান, তেমনি তোমরাও, আদমের সন্তানরা, পরস্পরের সমান। একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার দাবি করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা পরস্পরের ভাই।"

এরপর তিনি বললেন, "তোমরা কি জানো, এটি কোন মাস? তোমরা কি জানো, এটি কোন স্থান? তোমরা কি জানো, এটি কোন দিন?" লোকেরা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এটি সম্মানিত মাস, এটি সম্মানিত স্থান এবং এটি হজের দিন।"

প্রতিটি উত্তরের পর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "যেমন এই মাস সম্মানিত, যেমন এই স্থান সম্মানিত, যেমন এই দিন সম্মানিত, তেমনি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের জীবন ও সম্পদকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। কারো জীবন বা সম্পদের ওপর আঘাত করা এই মাস, এই স্থান এবং এই দিনের পবিত্রতা লঙ্ঘনের মতোই অবৈধ। এই নির্দেশ কেবল আজকের জন্য নয়, কেবল আগামীকালের জন্যও নয়; বরং যেদিন তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন পর্যন্ত।"

এরপর তিনি বললেন, "আজ আমি তোমাদের যা বলছি, তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিও। কারণ এমনও হতে পারে, যারা আজ আমার কথা শুনছে না, তারা যারা আজ শুনছে তাদের চেয়েও বেশি এর ওপর আমল করবে।"

(তাফসিরুল কুরআনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯)

হে নবী! আপনি ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় জয় করেছেন।
হে নবী! আপনি যুক্তি দিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করেছেন।
হে নবী! আপনি অজ্ঞতা দূর করেছেন।
হে নবী! আপনি শরিয়তকে পূর্ণতা দান করেছেন।
আপনি হালাল ও হারামের সব বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।
আপনার প্রতি শান্তি, বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক।

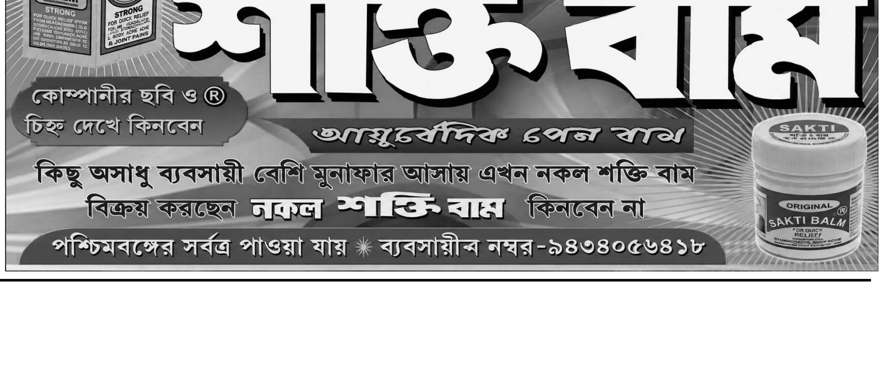

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর খুতবার আলোকে

আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার এই বিশাল ব্যবস্থার ওপর চিন্তা-ভাবনা করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বহু উপকারী শিক্ষা লাভ করেন। মানুষকে জামি' আস-সাগীর (ক্ষুদ্র সমষ্টি) বলা হয়েছে, কারণ সমগ্র বিশ্বের সমস্ত উৎকর্ষ কোনো না কোনোভাবে এই ক্ষুদ্র সমষ্টি অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং যখন আমরা চিন্তা করি এবং পর্যবেক্ষণ করি, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই তার প্রকৃত প্রিয়তমের প্রতি একটি আকর্ষণ স্থাপন করেছেন। যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন:

"যখন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তখন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে যে প্রথম আধ্যাত্মিক গুণ প্রকাশ পায় তা হলো, সে মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাকে ভালোবাসে। এরপর যখন তার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকশিত হয় এবং তার স্বভাবের কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হতে শুরু করে, তখন তার অন্তর্নিহিত এই প্রেমের আকর্ষণ আরও স্পষ্টভাবে নানা রঙ ও রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে সে মায়ের কোলে ছাড়া কোথাও স্বস্তি পায় না এবং তার পূর্ণ শান্তি কেবল মায়ের স্নেহের আলিঙ্গানেই নিহিত থাকে। যদি তাকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার সমস্ত আনন্দ তিক্ত হয়ে যায়। তার সামনে যদি আশীর্বাদের স্তূপও রাখা হয়, তবুও সে তার প্রকৃত সুখ কেবল মায়ের কোলেই দেখে এবং তা ছাড়া কোথাও শান্তি খুঁজে পায় না। তাহলে এই প্রেমের আকর্ষণ কী, যা তাকে মায়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়? প্রকৃতপক্ষে, এটাই সেই একই আকর্ষণ, যা প্রকৃত প্রিয়তমের জন্য শিশুর প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত, মানুষ যেখানেই কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেখানেই প্রকৃতপক্ষে এই একই আকর্ষণ কাজ করে এবং যেখানে সে এই গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস প্রদর্শন করে, তা আসলে সেই একই ভালোবাসারই প্রতিফলন।"

(ইসলামী উসূল কি ফালসাফী, রূহানী খাযায়িন, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩৬৪)

এরপর একই বিষয়কে আরও এগিয়ে নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অত্যন্ত সূক্ষ্মএকটি বিষয় তুলে ধরেছেন:

"আল্লাহ তাআলা মানুষকে কেবল ভালোবাসার জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, সে যেন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকে এবং চিরজীবন সেই সাগরে ডুবে থাকে, যা অনন্ত জীবন দান করে। যেমন একজন বলেছেন:

'মানুষকে হৃদয়ের স্মরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, নতুবা ইবাদতের জন্য অনুগত ফেরেশতার তো কোনো অভাব ছিল না।'

অর্থাৎ, মানুষকে কেবল এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে যেন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকে এবং সেই বেদনায় এক বিশেষ আনন্দ লাভ করে, যা ভালোবাসার অবশ্যম্ভাবী ফল। অন্যথায়, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের জন্য তো ফেরেশতারা আগেই উপস্থিত ছিল।"

(মুহাব্বত ইলাহী, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯-২০)

সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজের কর্মের মাধ্যমে এই ঐশী ভালোবাসার বিষয়টিকে বাস্তব রূপে প্রদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"একজন মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য, যা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: 'ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ' (আল-বাকারা: ১৬৬)- অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে, তারাই আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসে। সুতরাং মুমিন হওয়ার লক্ষণ হলো, একজন প্রকৃত মুমিনের জীবন কেবলমাত্র এক সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে এবং হওয়া উচিত। কারণ এটি ছাড়া কাউকে মুমিন বলা যায় না। অদৃশ্যে বিশ্বাস, নামাজ আদায়, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং নবীদের প্রতি ঈমান-এসব তখনই পূর্ণতা লাভ করবে, যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে এই গভীর ভালোবাসার এমন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে, এমনকি অবিশ্বাসীরাও বলতে বাধ্য হয়েছিল: 'আশিকা মুহাম্মাদুন রব্বাহু'-মুহাম্মদ তাঁর প্রতিপালকের প্রেমে উন্মাদ হয়ে গেছেন। আর তিনি আমাদের কীই না সুন্দর একটি দোয়া শিখিয়েছেন: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা প্রার্থনা করি, এবং তাদের ভালোবাসাও প্রার্থনা করি যারা তোমাকে ভালোবাসে। আমি তোমার কাছে এমন আমল করার তাওফীক চাই, যা আমাকে তোমার ভালোবাসায় পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! তোমার প্রতি এমন ভালোবাসা আমার অন্তরে স্থাপন করুন, যা আমার নিজের সত্তা, আমার সম্পদ, আমার পরিবার এবং এমনকি শীতল পানির প্রতিও আমার ভালোবাসার চেয়ে অধিক হয়।' অতএব, এটিই একজন মুমিনের মানদণ্ড ও বৈশিষ্ট্য, যা অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুমিনের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই অর্জন করা যায় না। তাই এই ভালোবাসা লাভের জন্যও তাঁর সামনে নত হওয়া এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করা অপরিহার্য।" (খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৩)

ঐশী ভালোবাসার এই পবিত্র কর্ম একতরফা নয়, কিংবা এটি কেবল একদিকে সীমাবদ্ধও নয়। বরং প্রকৃত প্রিয়তম, আল্লাহ তাআলাও স্বয়ং নিজ অনুগ্রহে তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন। কারণ,

"আল্লাহ তাআলা নিজেই চান যে তাঁর বান্দারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুক। যদি আকাঙ্ক্ষা কেবল আমাদের পক্ষ থেকেই হতো, তাহলে তা এক বিষয় ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যেমন একজন কবি বলেছেন:

'মিলনের আনন্দ তখনই, যখন উভয়েই ব্যাকুল থাকে,
উভয় দিকেই সমান আগুন জ্বলে।'

সুতরাং, যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর বান্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করেন, তাই কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।"

(হস্তী বারী তাআলা, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩৮)

অতএব, এই প্রসঙ্গেই যখন আমরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের পরিস্থিতির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিই, তখন দেখি যে তিনি 'আশিকা মুহাম্মাদুন রব্বাহু'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই জাগতিক দায়িত্ব ও ব্যস্ততা সম্পন্ন করার পর তাঁর একমাত্র কাজ ছিল তাঁর প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করা। তাঁর এই আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের ও নবীদের সঙ্গে এক বিস্ময়কর পদ্ধতিতে আচরণ করেন। তাঁরা নিজেদের আড়ালে রাখতে চান এবং আল্লাহর ইবাদতেই নিমগ্ন থাকতে চান, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের বাইরে এসে মানুষের সামনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। এর সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ উদাহরণ ছিলেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বহুদিন ধরে হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং তাঁর প্রতিপালকের স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। জাগতিক বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পার্থিব ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না এবং কখনো হবেও না। তবে তাঁর পরিধান, তাঁর শয্যা, তাঁর আহার ও পান-সবই ছিল আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় নিমগ্ন এবং ইবাদতে মগ্ন অবস্থায়। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর এমন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যার কোনো তুলনা নেই। আর আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা, যিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কারণে একটি বৈরী জাতির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং যিনি অসংখ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তিনি আল্লাহর ভালোবাসায় নিমগ্ন এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণই রইলেন। তিনি কোনো বিরোধিতারই পরোয়া করেননি এবং প্রতিটি মুহূর্তে নতুন উদ্যমে তাঁর কাজে নিমগ্ন থেকেছেন। দিন দিন, একজন করে, দুজন করে তাঁর আহ্বানের মাধ্যমে তাঁর জামাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতেই ইসলামের বাণী আরবের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিশ্ব দেখল যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬৪)

তিনি আরও বলেন:

"মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ বান্দা ছিলেন, তাঁর ইবাদতের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যার কোনো তুলনা নেই। কখনো তিনি নির্জন স্থানে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে, পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু থেকেই সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যেতেন। একদিন তাঁর একজন স্ত্রী রাতে তাঁকে শয্যায় না পেয়ে ধারণা করেছিলেন যে, হয়তো তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গেছেন। কিন্তু খোঁজাখুঁজির পর যখন তিনি সেই দৃশ্য দেখলেন, তখন নিজের সেই ধারণার জন্য গভীরভাবে লজ্জিত হলেন এবং ভাবলেন, 'আমি তাঁর সম্পর্কে কী জাগতিক ধারণাই না পোষণ করেছিলাম, অথচ তাঁর প্রকৃত মর্যাদা চিনতে পারিনি!' কারণ তিনি তাঁর প্রতিপালকের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এমনভাবে দোয়া করছিলেন, যার কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না। কেউ তাঁর প্রভুর সামনে তাঁর মিনতির আবেগকে ফুটন্ত হাঁড়ির শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আবার কেউ ভিন্ন উপমা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রভুর সামনে এই পরিপূর্ণ বান্দার ইবাদতের আবেগ সব ধরনের উপমার উর্ধ্বে। এমনকি কঠিন অসুস্থতার সময়ও তিনি জামাতে নামাজ আদায় পরিত্যাগ করেননি। তাঁর জীবনের শেষ অসুস্থতার সময়, চরম দুর্বল অবস্থায়ও তিনি মসজিদে এলেন। নিজের সামনে তাঁর অনুসারী ও মুসলমানদের জামাতে নামাজ আদায় করতে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন এবং বললেন, এটাই তো মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, যা এই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা এবং পরম করুণাময় আল্লাহর বান্দারা পূরণ করছে। তিনি বলেছেন, 'নামাজেই আমার চোখের শীতলতা।' নামাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি আমাদের সামনে এটাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নফল নামাজে অবিচলতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অবিচলতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর যে মর্যাদা ছিল, তা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কেবল সেই পরিপূর্ণ মানুষই সেই মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন। আর এ কারণেই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা তাঁর ওপর দরূদ প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

বলেছেন: 'লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ' (সূরা আল-আহযাব: ২২)-'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৪০)

তিনি অন্যত্রও ঐশী ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন সম্পর্কে বলেন:

"নবুওয়ত লাভের পূর্ববর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি নির্জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর একটি দোয়া রয়েছে। এই দোয়াটিই আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জনের জন্য তাঁর হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার পরিচয় বহন করে। তিনি তাঁর প্রতিপালকের সামনে অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে এই বলে দোয়া করতেন: 'হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ভালোবাসা দান করুন এবং এমন ব্যক্তির ভালোবাসা দান করুন, যার ভালোবাসা আপনার সান্নিধ্যে আমার জন্য উপকারী হবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেসব বিষয় প্রিয় মনে হয় সেগুলো দান করুন। সেগুলোকে আমার জন্য শক্তির উৎস, আপনার ভালোবাসায় অগ্রগতির মাধ্যম এবং ঈমানে উন্নতির উপায় বানিয়ে দিন। আর যেসব প্রিয় বস্তু আমাকে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সেগুলোর পরিবর্তে আমাকে সেসব বিষয় দান করুন, যা আপনার কাছে প্রিয়।'(খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৫৫৮)

আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো, প্রতিটি অবস্থায় তাঁর দিকেই ফিরে আসা। বদরের যুদ্ধের ঘটনা সুপরিচিত। আল্লাহ তাআলা নিজেই যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বিজয়ের সুসংবাদও দিয়েছিলেন। তবুও আল্লাহ তাআলার 'গনী' (অমুখাপেক্ষী) গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত আকুলতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে দোয়া করতে থাকতেন। এই অবস্থা উল্লেখ করে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"বদরের যুদ্ধে, উহুদের যুদ্ধে অথবা অন্য কোনো যুদ্ধে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের আধিক্য কি সেই ফলাফল সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছিল? নিশ্চয়ই না। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি, তাঁর আশ্বাস এবং তাঁর সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই বাহ্যিক ও সাধারণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর প্রধান মনোযোগ ছিল তাঁর দোয়ার প্রতি। আর এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বদরের যুদ্ধ এ বিষয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য উপস্থাপন করে। সব ধরনের সান্ত্বনা ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাকুলতা, তাঁর দোয়ার অবস্থা, তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ও তাঁর অবস্থা এমন ছিল যেন তিনি বারবার মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত হচ্ছেন। তাঁর দোয়ার সময় সেই গভীর আবেগের কারণে বারবার তাঁর কাঁধ থেকে চাদর সরে যাচ্ছিল।" (খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫৬১)

অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলার মহিমা এমন যে, যদি কোনো বান্দা তাঁর দিকে এক কদম এগিয়ে আসে, তবে তিনি সেই বান্দার দিকে দশ ধাপ এগিয়ে আসেন। যদি বান্দা তার প্রতিপালকের দিকে হেঁটে আসে, তবে প্রতিপালক তার দিকে দৌড়ে আসেন। তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যদি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতিপালকের ভালোবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেন, তবে আল্লাহ কি তাঁকে তাঁর উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন না? অবশ্যই দেবেন, এবং তিনি দিয়েছেনও। অতএব, প্রথমত আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিষ্পাপতার (ইসমত) মর্যাদা দান করেন, অর্থাৎ তাঁকে পাপমুক্ত করে দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁকে এমন এক মর্যাদা দান করেন যে, কোনো বান্দা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য ও ভালোবাসায় নিজেকে বিলীন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে পারে না। সংক্ষেপে, তাঁকে 'দানা ফাতাদাল্লা'-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন যে, নবীগণ আল্লাহর ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকার কারণেই নিষ্পাপ হন।
(তাফসীর হযরত মসীহ মওউদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৯)

এরপর 'দানা ফাতাদাল্লা' এবং ঐশী ভালোবাসা অর্জনের শর্তাবলি সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেছেন:

"মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি হাদিসে কুদসী রয়েছে: 'লাওলাকা মা খালাকতুল আফলাক'-আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আমি যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে আমি আসমানসমূহও সৃষ্টি করতাম না।' মুসলমানদের একটি বড় অংশ এই হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে আপত্তি করে। কিন্তু এই যুগের ইমাম এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রকৃত প্রেমিক আমাদের এটির সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এটি সেই মর্যাদা, যা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বোচ্চ অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে। তিনি সকল রাসূলের উর্ধ্বে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, তাঁর অনুসরণ করার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করে। তাঁকে খাতামে নবুওয়তের মর্যাদা দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সকল নবীর ওপর মোহর হিসেবে তাদের নবুওয়তকে সত্যায়িত করে। তাঁকে খাতামুন নাবিয়্যীন-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে। আর তাঁরই একজন অনুসারী, একজন উম্মত এবং তাঁর প্রকৃত প্রেমিক-প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নবুওয়তের মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাঁর প্রতিপালকের নৈকট্য, যা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন: 'সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা' (সূরা আন-নাজম: ৯)-এটাই আল্লাহ তাআলার সর্বোচ্চ নৈকট্য।" (খুতবাতে মাসরূর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৯)

সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করার তাওফীক আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দান করুন এবং আমাদের সবাইকে ঐশী ভালোবাসার জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

****

১৫পাতার পর......

অতএব, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং তাঁর মহান আদর্শের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। এই যুগে তাঁর সত্যনিষ্ঠ খাদেম সেই শিক্ষাগুলো ও সেই উত্তম আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা সমগ্র বিশ্বকে সেই শিক্ষার দিকেই আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ আজ মানবজাতির সামনে যে ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ হলো জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভেদ, বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে বৈষম্য এবং ধর্মীয় মতপার্থক্যকে উন্মাদনার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এগুলো মানুষকে মানবতা থেকে এতটাই নিচে নামিয়ে এনেছে যে, তা হত্যা ও রক্তপাতের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মানবসৃষ্ট সন্ত্রাসবাদ ও আত্মঘাতী হামলার পাশাপাশি আমরা প্রায় প্রতিদিনই অত্যন্ত বিধ্বংসী অস্ত্র ও ড্রোন হামলার মাধ্যমে নিষ্পাপ শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের নির্মম হত্যার ঘটনা শুনছি ও দেখছি।

আমাদের প্রিয় নেতা, হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.), বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান আদর্শের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন-

"পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষার উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে অমুসলিমদের সঙ্গে উত্তম আচরণ, তাঁদের অধিকার সংরক্ষণ, তাঁদের প্রতি ন্যায়বিচার করা, ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি না করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে কোনো কঠোরতা প্রদর্শন না করার বহু নির্দেশ রয়েছে-শুধু নিজের সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং অমুসলিমদের প্রতিও... এই রহমতের প্রতিমূর্তি, মানব-হিতৈষী এবং মানবাধিকারের মহান রক্ষকের অবস্থা এমন ছিল যে, যুদ্ধাবস্থাতেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এমন কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না, যা শত্রুর জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে। তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি সেকেন্ড সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন মূর্তিমান রহমত। তাঁর বক্ষে এমন একটি হৃদয় স্পন্দিত হতো, যা দয়ার যে উচ্চতম মান ও দাবি তিনি পূরণ করেছিলেন, তা অন্য কোনো হৃদয়ের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব ছিল না-শান্তিকালে হোক বা যুদ্ধকালে, ঘরে হোক বা বাইরে, দৈনন্দিন জীবনে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে আচরণে কিংবা তাঁদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিগুলোতে। তিনি বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার এমন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, যা অনুকরণীয়। এরপর যখন তিনি একজন মহান বিজয়ী হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি শুধু বিজিত জনগণের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনই করেননি, বরং তাঁদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি কুরআনের এই নির্দেশের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন: 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।' (সূরা আল-বাকারাঃ ২৫৭) ধর্ম হৃদয়ের বিষয়। আমার কামনা এই যে, তোমরা সত্য ধর্ম গ্রহণ করো, তোমাদের পার্থিব জীবন ও পরকালকে উন্নত করো এবং মুক্তির ব্যবস্থা করো-কিন্তু এতে কোনো জবরদস্তি নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন ধর্মীয় ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতার অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।" (জুমার খুতবা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

আমরা মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তিনি যেন বিশ্বের সব সরকারকে, বিশেষ করে মুসলিম সরকার ও সংগঠনগুলোকে, ইসলামের এই শিক্ষাসমূহ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই মহান আদর্শ অনুসারে বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের তাওফীক দান করেন। আমীন।

আর আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহর যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028

Vol-11 Thursday, 23-30 July, 2026 Issue No.30-31

Act. MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৬৯} আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

আমার সম্মানিত মা আমাকে বলেছেন যে, বিবাহের পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ দিল্লিতে হবে। সেই অনুসারে তিনি এটি মাওলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর কাছে উল্লেখ করেন। যেহেতু সে সময় বাটালভী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সকল মেয়েদের একটি তালিকা রাখতেন এবং মীর সাহেবও আহলে হাদীস ছিলেন এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন, তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর কাছে মীর সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তখন মীর সাহেবকে চিঠি লেখেন।

প্রথমে মীর সাহেব বয়সের পার্থক্যের কারণে প্রস্তাবটি অপছন্দ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তখন আমাকে বিবাহ করার জন্য দিল্লি সফর করেন। শেখ হামিদ আলী এবং লালা মুলাওয়ামল তাঁর সাথে ছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানটি মাওলভী নাজির হুসাইনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এটি সোমবার, ২৭ মুহাররম, ১৩০২ হিজরিতে ঘটে। সে সময় আমার বয়স আঠারো বছর ছিল।

বিবাহের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাওলভী নাজির হুসাইনকে পাঁচ টাকা এবং একটি জায়নামাজ উপহার হিসেবে দেন।

সে সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিল।

আমার সম্মানিত মা আরও বলেছেন যে তোমার বড় চাচা আমার বিবাহের প্রায় দেড় থেকে দুই বছর আগে ইন্তেকাল করেন। বড় চাচা ১৮৮৩ সালে ইন্তেকাল করেন, যখন বরাহীন-ই-আহমদীয়্যার লেখার শেষ পর্যায়ে ছিল। আমার সম্মানিত মায়ের বিবাহ ১৮৮৪ সালের নভেম্বর হয়। আমি আমার সম্মানিত মায়ের কাছ থেকে আরও জেনেছি যে বিবাহটি মূলত রবিবারের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে সোমবারে পরিবর্তন করেন।

{৭০} আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অত্যন্ত দয়ালু। কাজী আমীর হুসাইন সাহেব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর যুগ ছিল অদ্ভুত। কাদিয়ানে তীব্র গরম দুই দিনের বেশি স্থায়ী হতো না, কারণ তৃতীয় দিনে বৃষ্টি হতো। যখনই গরম আবহাওয়া শুরু হতো এবং আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বলতাম, "হুজুর, খুব গরম", তখন পরের দিন বৃষ্টি হতো।

মাওলভী সৈয়দ সরওয়ার শাহ সাহেবও বর্ণনা করেছেন যে সে সময় ফসল সম্পর্কে কখনো কোনো অভিযোগ ছিল না।

যখন আমি বাড়ি ফিরে এসে এটি আমার সম্মানিত মাকে বললাম, তিনি বললেন যে যখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন, "আজ খুব গরম", তখন সাধারণত সেদিনই অথবা পরের দিন বৃষ্টি হতো। তিনি আরও বলেন, "তাঁর সময়ের পর কিন্তু মাসের পর মাস আকাশ থেকে আগুন পড়ে এবং কোনো বৃষ্টি হয় না।"

প্রতিশ্রুত মসীহের জীবদ্দশায় কাদিয়ানে কখনো ইস্তিসকার নামাজ পড়া হয়নি, যেখানে তাঁর পরে একাধিকবার পড়া হয়েছে।

(এই বর্ণনা সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় ইস্তিসকার নামাজ কখনো পড়া হয়নি বলে আমার বিশ্বাস পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়ায়েত নং ৪১৫ দেখুন। তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় কাদিয়ানে দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র গরম সাধারণত হতো না বলে আমার অভিমত সঠিক।)

{৭১} আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অত্যন্ত দয়ালু। প্রাতঃভ্রমণের জন্য বের হওয়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল। তাঁর খাদিমগণ তাঁর সাথে থাকতেন এবং তাঁরা প্রায়শই এক বা দুই মাইল হাঁটতেন। তিনি খুব দ্রুত হাঁটতে অভ্যস্ত ছিলেন, তবুও তাঁর চালচলন সবসময় মর্যাদাপূর্ণ থাকতো।

হাঁটতে বের হওয়ার সময় তিনি হযরত মাওলভী সাহেব (প্রথম খলীফা)-কে সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। তবে যেহেতু মাওলভী সাহেব খুব ধীরে এবং সতর্কতার সাথে হাঁটতেন, তিনি শীঘ্রই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পিছনে পড়ে যেতেন। যখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটি বুঝতে পারতেন, তিনি রাস্তায় কিছুক্ষণ থেমে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। কিন্তু আর একটু দূরে হাঁটার পর মাওলভী সাহেব আবার পিছনে পড়ে যেতেন এবং দুই বা চারজন লোক তাঁর সাথে থেকে যেতেন।

আমি এটাও দেখেছি যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবকে এই প্রাতঃভ্রমণে সাথে নিতেন। অনেকবার তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে বাজারে খাদিমদের সাথে নওয়াব সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতেন। কখনো কখনো নওয়াব সাহেব দেরি করতেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর দরজার বাইরে বাজারে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না তিনি বের হন, তারপর তাঁরা একসাথে যেতেন।

এই হাঁটার সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর খাদিমদের সাথে কথোপকথন করতেন। তিনি কথা বলতে থাকতেন এবং যাঁরা সংবাদপত্রের জন্য তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের নোট তৈরি করতেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সাধারণত বসরাওয়ান রাস্তা অথবা বুটার রাস্তায় হাঁটতে যেতেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর বাগানের দিকেও যেতেন, যেখানে তুত ও বীজবিহীন তুত সংগ্রহ করে তাঁর খাদিমদের সামনে রাখা হতো। তিনি নিজেও সেগুলি খেতেন।

কখনো কখনো হাঁটার সময় কারো পা অসাবধানতাবশত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাঁটার লাঠিতে পড়ে যেত এবং লাঠিটি তাঁর হাত থেকে পড়ে যেত। সেক্ষেত্রে তিনি কখনো পিছন ফিরে দেখতেন না যে কে এটি ঘটিয়েছে।

কখনো কখনো, বিশেষ করে সালানা জলসার সময়, এত বেশি লোক তাঁর সাথে হাঁটতে যেত যে কিছু খাদিম নিজ উদ্যোগে একে অপরের হাত ধরে তাঁকে তিন দিক থেকে ঘিরে একটি প্রতিরক্ষামূলক বৃত্ত তৈরি করতেন যাতে তিনি অসুবিধায় না পড়েন।

তবে তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত শেষ সালানা জলসার সময়, যখন তিনি উত্তর দিকে বুটারের দিকে হাঁটতে বের হন, তখন এত বড় ভিড় তাঁকে ঘিরে জমা হয় যে হাঁটা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং অল্প দূরত্ব অতিক্রম করার পরই তিনি ফিরে আসেন।

আমার মনে আছে যে একবার, পূর্ব দিকের বসরাওয়ান রাস্তা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফেরার সময়, মির্জা নিজামুদ্দিন, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চাচাতো ভাই কিন্তু একজন দৃঢ় বিরোধী ছিলেন, ঘোড়ায় চড়ে কাদিয়ানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আসতে দেখে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার এক পাশে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে যান। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন পাশ দিয়ে যান, তিনি সম্মানের সাথে মাথা নত করে সালাম দেন।

যখনই কেউ পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত তুলে অভিবাদন জানাতেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হাত তুলে উত্তর দিতেন।

{৭২} আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

প্রতিশ্রুত মসীহ মাঝারি উচ্চতার ছিলেন। তাঁর গায়ের রং গমের মতো, মুখমণ্ডল পূর্ণ, চুল সোজা ও নরম এবং হাত-পা সুগঠিত ছিল। তাঁর শেষ বয়সে শরীর কিছুটা ভারী হয়ে যায়।

তাঁর চেহারা ও বৈশিষ্ট্যে আল্লাহপ্রদত্ত একটি নূর ছিল। তবুও যাঁরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তাঁদের হৃদয় তাঁর প্রতি ভালোবাসায় ভরে যেত এবং কোনো অদৃশ্য শক্তি মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করতো।

শত শত লোক বিরোধী মনোভাব নিয়ে আসতেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখামাত্রই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে যেতেন। তাঁরা কোনো যুক্তি বা প্রমাণ চাইতেন না।

তাঁর এমন ভয় ছিল যে অনেক কঠিন প্রকৃতির লোক খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সামনে আসতেন, কিন্তু একবার তাঁর সামনে দাঁড়ালে তাঁরা একটি কথাও বলতে অক্ষম হয়ে পড়তেন।

{৭৩} আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

মাওলভী সৈয়দ মুহাম্মদ সরওয়ার শাহ সাহেব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় মারদান থেকে এক ব্যক্তি মিয়াঁ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মারদানীর সাথে হযরত মাওলভী নুরুদ্দীন সাহেব, প্রথম খলীফার চিকিৎসার জন্য কাদিয়ানে আসেন।

এই ব্যক্তি আহমদীয়াতের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত অনীহা নিয়ে কাদিয়ানে আসতে সম্মত হয়েছিলেন। তবে আসার আগে তিনি মিয়াঁ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের কাছে একটি শর্ত রাখেন: "কাদিয়ানে আহমদী এলাকার বাইরে আমার থাকার ব্যবস্থা করুন এবং আমি কখনো সেই এলাকায় প্রবেশ করব না।"

সেই অনুসারে তিনি আসেন এবং আহমদী পাড়ার বাইরে থাকেন এবং হযরত মাওলভী সাহেব তাঁর চিকিৎসা করেন। কয়েক দিন পর, যখন তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়, তিনি ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন।

মিয়াঁ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব তাঁকে বললেন, "আপনি কাদিয়ানে এসেছেন এবং এখন চলে যাচ্ছেন। অন্তত আমাদের মসজিদটি দেখে যান।"

তিনি অস্বীকার করেন। মিয়াঁ সাহেব জোরাজুরি করতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি শেষ পর্যন্ত এই শর্তে সম্মত হন যে তাঁকে এমন সময়ে নিয়ে যাওয়া হবে যখন সেখানে কোনো আহমদী উপস্থিত থাকবে না এবং মির্জা সাহেবও সেখানে থাকবেন না।

সেই অনুসারে মিয়াঁ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব এমন একটি সময় বেছে নেন এবং তাঁকে মুবারক মসজিদে নিয়ে আসেন। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে, যে মুহূর্তে সেই ব্যক্তি মসজিদে পা রাখেন, ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঘরের একটি জানালা খুলে যায় এবং প্রতিশ্রুত মসীহ কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদে আসেন।

সেই ব্যক্তির চোখ প্রতিশ্রুত মসীহের উপর পড়ে। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন, তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে যান এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বাইআত গ্রহণ করেন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir